সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ)

বিশ্ব-সভ্যতায় রাসূলে আকরাম (সা)

সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ)-এর
খাদেম ও খলিফা
মাওলানা জুলফিকার আলী নদভী (ফাজেলে দেওবন্দ)
শিক্ষক, মাদরাসাতুল হুদা, বাসাবো, ঢাকা
কর্তৃক অনুদিত

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বিশ্ব-সভ্যতায় রাসূলে আকরাম (সা)
মূল : সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ)
অনুবাদ : জুলফিকার আলী নদভী (ফাজেলে দেওবন্দ)

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবদুর রউফ
মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা: 01822-806163, 01728-598440

প্রকাশকাল
এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
বৈশাখ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
রজব, ১৪৩৭ ঈসায়ী

অক্ষর সংযোজন
মাহফুজ কম্পিউটার

মুদ্রণ
মেসার্স তাওয়াক্কাল প্রেস
৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য : ১৬০.০০ (একশত ষাট) টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-91841-5-7

BISHWA SABHYATAY RASUL AKRAM (SM) : Written by Sayed Abul Hasan Ali Nadvi (Rh.), Translated by Julfiqar Ali Nadvi, Published by Muhammad Abdur Rouf, Muhammad Brothers, 38, Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh Printed by M/S Tawakkal Press, 66/1, Naya Paltan, Dhaka-1000. Cell : 01822-806163; Price : Tk. 160.00/- Only. U$: 5.00 Only.

(27) تہذیب وتمدن پر اسلام کے اثرات اور احسانات

از سید ابوالحسن علی ندویؒ

مترجم: مولانا ذوالفقار علی ندوی

ناشر: محمد برادرس 38، بنگلہ بازار، ڈھاکہ 1100.

উৎসর্গ

মুসলমান হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র যে সব বান্দাহ্ দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে নিত্য জুলুমের শিকার হয়ে মুক্তির দুঃসহ প্রহর গুনছে তাঁদের সবর এখতিয়ারের তওফীক কামনায়–

প্রকাশকের কথা

সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ) মুসলিম বিশ্বের অবিনাশী ঈমানী চেতনার উজ্জ্বল বাতিঘর। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি উদার, বৈশ্বিক ও সর্বজনীন। তাঁর লেখনি ক্ষুরধার হলেও যৌক্তিক। ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য তাঁর কলমে যেভাবে বাঙ্ময় হয়েছে, তা রীতিমত বিস্ময়কর। তাঁর লিখিত 'বিশ্ব-সভ্যতায় রাসূলে আকরাম (সা)' শীর্ষক বক্ষ্যমান গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে নতুন সংযোজন। এটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহের অনবদ্য সংকলন। সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ) এর খাদেম ও খলিফা এবং ঢাকার বাসাবোস্থ মাদরাসাতুল হুদার শিক্ষক মাওলানা জুলফিকার আলী নদভী (ফাজেলে দেওবন্দ) কর্তৃক অনুদিত এ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহ্ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করছি।

বিজ্ঞ লেখক এ গ্রন্থে নির্ভেজাল তাওহীদের চেতনা, সাম্যের ধারণা, মানুষের মর্যাদা, চারিত্রিক নৈতিকতা, পারিবারিক বন্ধন, নারীর অধিকার পুনরুদ্ধার, বর্ণবাদের মূলোৎপাটন, শ্রেণী বৈষম্যের অবসান, সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ, মানবীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা, দ্বীন-দুনিয়ার সমন্বয়, আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলো সবিস্তারে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি তাঁর নিবন্ধসমূহে কেবল সমস্যাকে চিহ্নিত করেননি বরং সমাধানের পথও নির্দেশ করেছেন। ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্পকলা ও কারিগরি বিদ্যার উৎকর্ষ সাধনে যে কার্যকর ভূমিকা ও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে– তা এ গ্রন্থে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। মানবসভ্যতার বিকাশধারায় ইসলামের অবদান এ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। নিজের বক্তব্যকে জোরালো ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য প্রাজ্ঞ এ পণ্ডিত প্রাচ্যবিদদের (Orientalists) প্রাসঙ্গিক বক্তব্য চয়নে কার্পণ্য করেননি।

"মুহাম্মদ ব্রাদার্স" বাংলাদেশে একমাত্র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, যে সংস্থা হযরত মাওলানার সর্বাধিক গ্রন্থাদি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার গৌরব অর্জন করেছে এবং এর ব্যবস্থাপনায় সাইয়িদ আবুল আবুল হাসান আলী নদভী (রহ)-এর সব গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করে মুদ্রণ ও প্রকাশের পরিকল্পনা হাতে

নিয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৫টি গ্রন্থ বাজারে এসেছে। বাকীগুলোর অনুবাদের কাজ এগিয়ে চলেছে। 'বিশ্ব-সভ্যতায় রাসূলে আকরাম (সা)' শীর্ষক গ্রন্থটি হযরত মাওলানার অপরাপর গ্রন্থের মত পাঠকপ্রিয়তা পাবে– এটি আমাদের আস্থা ও প্রতীতি। মহান আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের তাওফিক দান করুন ও আমাদের সৎপ্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন।।

– মুহাম্মদ আবদুর রউফ

অনুবাদকের আরজ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين۔ اما بعد۔

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। এ মুহূর্তে অধমের ক্বলব ও কলম, দিল ও দেমাগ, অস্থি-মজ্জা আল্লাহ্‌র মহান দরবারে সিজদাবনত। কারণ, তিনি তাঁর এ অধম বান্দাকে দ্বীনের কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন। বর্তমান এ কঠিন যুগে দ্বীনের কাজ করতে পারা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়।

আমার মুরশিদ ও মাখদূম ইসলামী চিন্তার পথিকৃত বিশ্ববরেণ্য দা'ঈ আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী হাসানী নদভী (রহ) ও তাঁর গ্রন্থসমুহকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, বর্তমান বিশ্বে সকল স্তরের দ্বীন দরদী ও দ্বীনের মুখলিছ খাদেমগণ তথা ইসলাম প্রিয় মুসলমানগণ তাঁর গ্রন্থসমুহ থেকে ব্যাপক হারে উপকৃত হচ্ছেন। ফলে, তাঁর গ্রন্থসমুহ সর্বজন সমাদৃত হয়ে মুসলিম উম্মাহর চোখের জ্যোতি ও হৃদয়ের আলোতে পরিণত হয়ে তা স্ব-মহিমায় চির ভাস্মর হয়ে আছে। বর্তমান সংকটময় মুহূর্তে মুসলিম উম্মাহ প্রত্যহ তা থেকে আলোর মশাল ও পথের দিশা খুঁজে পাচ্ছে, প্রতিনিয়ত তা যেন হীরার জ্যোতি "সিরাজাম মুনীরা" এর ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমানে আধুনিক শিক্ষিতদের মাঝে একশ্রেণীর মানুষকে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে দেখা যাচ্ছে। মূলতঃ এর নেপথ্যে কারণ হলো, বিশ্ব-সভ্যতায় ইসলাম ও রাসুলুল্লাহ (সা) এর অবদান তাদের সামনে নেই। অন্যদিকে, তারা ইসলাম বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদদের চিন্তা-চেতনা ও রচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হীনমন্যতার শিকার হচ্ছে। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে 'বিশ্ব-সভ্যতায় রাসুলে আকরাম (সা)' নামক গ্রন্থটি আধুনিক

শিক্ষিত শ্রেণীকে মানসিকভাবে আশ্বস্থ করতে এবং তাদেরকে ঈমানী চেতনায় বলিয়ান করতে সক্ষম হবে।

গ্রন্থ সম্পর্কে মূল ভূমিকাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয় যে, গ্রন্থের শেষ অধ্যায় "আখলাক ও নৈতিকতা" অংশটি হযরতের অন্য গ্রন্থ " السيرة النبوية " থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে "নবীয়ে রহমত" থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। এ অংশটি গ্রন্থের সাথে সংযোজন করার কারণ হলো, মানুষের মাঝে যা কিছু ভাল আখলাক ও নৈতিকতা রয়েছে তা রাসুলে আকরাম (সা)-এর অবদান, আর যারা আদর্শ মানুষ হতে চাই ও আদর্শ সমাজ গড়তে চাই, তাদের জীবনে রাসুলুল্লাহ (সা) এর আখলাক ও নৈতিকতা বড় অবদান রাখবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

পরিশেষে 'মুহাম্মদ ব্রাদার্স' এর সত্ত্বাধিকারী জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, আমার কতপিয় ছাত্র যারা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে সহযোগিতা করেছিল এবং আমার বিবি, যে তার বহুবিধ অসুবিধার মাঝেও আমাকে লেখার কাজে উৎসাহ প্রদান ও সহযোগিতা করেছে, তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তাদের উত্তম বিনিময় প্রদান করুন এবং আমাদের সকলের সৎ মেহনত কবুল করুন। আরো দু'আ করি যে, আল্লাহ্ যেন আরবী মূল গ্রন্থের মতই এ অনুবাদ গ্রন্থটি কবুল করেন। আমীন।

২৪-০৪-২০১৬ইং, বাসাবো, ঢাকা — জুলফিকার আলী নদভী

সূচিপত্র

উৎসর্গ/০৩
প্রকাশকের কথা/০৫
অনুবাদকের আরজ/০৭
গ্রন্থ পরিচিতি/০৯
ভূমিকা/১৪

বিশ্ব-সভ্যতায় ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (সা)/২১-২৫
বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি/২১
অত্যন্ত কঠিন ও নাজুক কাজ/২২
রাসূলুল্লাহ (সা) ও ফলপ্রসু কর্মের সীমাবদ্ধকরণের জটিলতা/২৩
রাসূলুল্লাহ (সা) ও ইসলামের বিশ্বজনীন প্রভাব/২৩
পৃথিবীর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) ও ইসলামের দশটি মৌলিক অবদান/২৪

তাওহীদের স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন আকীদা-বিশ্বাস/২৬-৩৬
রাসূলে আকরাম (সা)-এর মহাঅনুগ্রহ/২৬
একত্ববাদের বিশ্বাস ও জীবনের উপর-এর প্রভাব/২৭
পৃথিবীতে তাওহীদের কলরবমুখর গুঞ্জরণ ও অন্য ধর্মের উপর এর প্রতিক্রিয়া/২৮
ভারতের ওপর একত্ববাদের প্রভাব/৩০
খ্রিস্টান জগতের উপর তাওহীদের প্রভাব/৩২
এ সকল চেষ্টা কেন বিফল হলো এবং কেন তা দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হয়নি/৩৫

মানবীয় ঐক্য ও সাম্যের ধারণা/৩৭-৪৬
মানবীয় ভ্রাতৃত্বের শক্তিশালী ও ঐতিহাসিক ঘোষণা/৩৭
ইসলাম-পূর্ব মানব সমাজ এবং এতে ব্যক্তি ও গোত্রের মাহাত্ম্য/৪১
ইসলামের সাম্যের দারণা ও বিশ্বব্যাপি এর প্রভাব/৪৩

মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা/৪৭-৫২
তৃতীয় মহৎ অবদান/৪৭

নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও তার অধিকার পুনরুদ্ধার/৫৩-৬৬
ইসলাম-পূর্ব সময়ে নারী জাতির অবস্থা/৫৩
বৌদ্ধ ধর্মে নারী/৫৭
হিন্দু ধর্মে নারী/৫৭
চীনে নারী/৫৮

বৃটিশ সমাজে নারী/৫৯
ইসলামি শিক্ষা/৫৯
পশ্চিমা পণ্ডিত ও ইনসাফপ্রিয় মনীষীদের সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি/৬৩
নব জীবনের সূচনা এবং মহাবিপ্লব/৬৫

হৃদয়ে হৃদয়ে ছেয়ে গেল আশা-আকাঙ্ক্ষার আলো, দূর হয়ে গেল হতাশাবোধ ও কুলক্ষণাভাব, ভরে গেল আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মমর্যাদাবোধের দীপ্তি/৬৭-৭২
মানুষের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন/৬৭
গুনাহ মানব স্বভাবের জন্য সাময়িক ও বহিরাগত, আর কল্যাণকামিতা ও শান্তিপ্রিয়তা প্রকৃতিগত/৬৮
তাওবার মর্যাদা ও স্থান/৬৮
তাওবাকারীদের সম্মাননা/৭০
মানবতার জন্য রহমত ও সুসংবাদ/৭২

দ্বীন ও দুনিয়ার সমন্বয় এবং যুদ্ধমান ও পরস্পর বিরোধী শ্রেণীর ঐক্য/৭৩-৭৮
বিভক্ত মানবতা এবং রণক্ষেত্র দুনিয়া/৭৩
এ দৃষ্টিভঙ্গির স্বাভাবিক পরিণতি/৭৩
ঐক্যবাদী ধর্ম ও তার ব্যাপকতা/৭৪
খ্রিস্টীয় ইউরোপে দ্বীন ও দুনিয়া এবং রাজা ও গির্জার দ্বন্দ্ব/৭৫
বিচ্ছেদের পরিবর্তে মিলন/৭৭
গোট জীবনই ইবাদত আর সমগ্র বিশ্ব হলো ইবাদতের স্থান/৭৭

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের সংশ্লিষ্ঠতা এবং এক পবিত্র ও স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন এবং একের সাথে অন্যের সম্পর্ক জুড়ে দেওয়া/৭৯-৯০
পবিত্র স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন/৭৯
এক অনাকাঙ্ক্ষিত সূচনা/৮১
দ্বীনের মেজায নির্ধারণ/৮৩
জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপারে কিছু ধর্ম ভীত/৮৩
জ্ঞানের বিক্ষিপ্ত পুথিগুলোকে এক সুতোয় বাঁধা/৮৭

জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা ধর্মীয় বিষয়ে উপকৃত হওয়া এবং মানব প্রকৃতি ও বিশ্বজগৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রতি উৎসাহ প্রদান/৯১-৯৬
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে প্রাচীন ধর্মসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি/৯১
দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির দাওয়াত/৯১
চিন্তার আহ্বানের প্রভাব ও সুফল/৯৪

বিশ্বনেতৃত্ব প্রদানকারী, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নীতি-নৈতিকতার পতাকাবাহী এক জাতির উত্থান /৯৭-১০৪
একটি আদর্শ নেতৃত্ব প্রদানকারী জাতির প্রয়োজন/৯৭
নির্বাচিত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত উম্মত/৯৭
সমাজ ও সংস্কৃতির অঙ্গনে সুস্থ বিপ্লবের প্রয়োজন/৯৯
বিশ্ব তদারকি/১০১
উম্মতের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব ও পর্যবেক্ষণ/১০৩

আকীদা-বিশ্বাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশ্ব ঐক্য/১০৫-১১০
অনন্য বিশ্ব ঐক্য/১০৫
ঐক্যের অনন্য নিদর্শন/১০৬
পশ্চিমা পণ্ডিতদের সাক্ষ্য/১০৭
ইসলামি সভ্যতার প্রাণ ও প্রকৃতি/১০৮
ইসলামি ইতিহাসে সংস্কার ও সংশোধন আন্দোলনের সফলতার রহস্য/১০৯
মানব সভ্যতাকে কর্মচঞ্চল করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকা উচিত/১০৯

বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ পয়গাম্বর এবং বিশ্বের জন্য অনুগ্রহ স্বরূপ দ্বীনী দাওয়াত/১১১-১১২

আখলাক ও নীতি-নৈতিকতা/১১৩-১৪৭
রাসূলুল্লাহ (সা) কেমন ছিলেন/১১৩
আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক/১১৮
পার্থিব সম্পদ ও এর প্রতি অনীহা/১২০
আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের সঙ্গে আচরণ/১২৩
স্বভাব-প্রকৃতিতে ভারসাম্য/১২৮
ঘরে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে/১৩০
সূক্ষ্মতর অনুভূতি, আবেগের মর্যাদা ও পবিত্রতা/১৩৩
উদারতা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা/১৩৬
তাঁর বিনয়/১৪০
বীরত্ব, সাহসিকতা ও লজ্জা-শরম/১৪২
স্নেহ-ভালবাসা ও সাধারণ দয়ামায়া/১৪৪
বিশ্বজয়ী আদর্শ ও চিরন্তন নমুনা/১৪৭
মুহাম্মদ ব্রাদার্স প্রকাশিত অন্যান্য কিতাবসমূহ/১৫২

গ্রন্থ পরিচিতি

মহান আল্লাহ্‌র যথাযথ প্রশংসা এবং রসূল (সা)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম। ইসলামি ইতিহাস-দর্শনের মূল উৎসই হলো পবিত্র কুরআন ও হাদীস। কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাসমূহ যখন নিজের ইতিহাস সৃষ্টিকারী ভূমিকা পালন করা শুরু করে, তখন তার প্রেক্ষাপটে ইসলামের ঐতিহাসিক চেতনা ও ইতিহাস-দর্শন এবং জীবন ও বিশ্ব সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর ছিল। মানবতাকে অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতির মানদণ্ড ও মূল্যবোধ এবং নিয়ম-নীতি ও মূলনীতি প্রদান করার সাথে সাথে ইসলাম তাকে ইতিহাসের একটি সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকর দর্শন প্রদান করেছে যাকে 'সুন্নাতুল্লাহ' দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এর মাঝে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় না।

[সূরা আহযাব : ২৬]

তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ফয়সালা ও তাঁর কুদরত, ক্ষমতা, ইচ্ছা ও বাসনা, স্বীয় কর্মক্ষমতায় তাঁর স্বাধীনতায় নিরংকুশ ক্ষমতা ও ব্যাপক কর্তৃত্বের উপর ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাস– ইসলামি ও মানব ইতিহাসকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। আর আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীসমূহ-

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَأْنٍ -

"প্রতিদিন তিনি বিশেষ অবস্থায় থাকেন।" অর্থাৎ প্রতিদিন তাঁর নতুন নতুন অবস্থা প্রকাশ পায়। [সূরা আর-রহমান : ২৯]

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا

"আর তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না।" [সূরা আনআম : ৫৯]

পৃথিবীকে বলে দিয়েছে, মানবীয় ইতিহাসের পিছনে একটি অদৃশ্য হাত, গায়েবী শক্তি কর্মতৎপর রয়েছে। বস্তুত ঐতিহাসিক উপাদান ও উপকরণ এবং জাগতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন থেকেও বহুগুণ বেশি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও কুদরত তৎপর রয়েছে। আল্লাহ্‌র সত্তা জীবন ও জগৎ হতে পৃথক নয়, বরং প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর নিয়ন্ত্রণকারী ও পর্যবেক্ষণকারী এবং তাঁর প্রকৃত কর্তা ও কর্মবিধায়ক এবং সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর স্রষ্টাসুলভ সম্পর্ক সর্বদা অব্যাহত রয়েছে :

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ-

"তাঁর বিষয়টি এমন যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলেন, 'হও', আর তা হয়ে যায়।" [সূরা ইয়াসীন : ৮২]

কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, পরিশেষে সত্যের বিজয় হয়। اَلْحَقُّ يَعْلُوْ وَلَا يُعْلٰى "সত্য বিজয়ী হয় এবং তা পরাজিত হয় না।"

বিলম্বে বা প্রারম্ভে আখিরাত ছাড়াও দুনিয়াতেই সত্যের বস্তুগত বা অর্থগত ও নীতিগত বিজয় হয় এবং তা বাতিল ও অসত্যের উপর সর্বাবস্থায় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা হককে প্রভাবিত করার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণ এবং মানব প্রকৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা রেখেছেন। যে কারণে হকপন্থি ও সত্যের অনুসারীরা সফলতা লাভ করে। তাই পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ইরশাদ হয়েছে :

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ "শেষ পরিণতি মুত্তাকীদের জন্য।" [সূরা কাসাস : ৮৩]

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সবরকারীদের সাথে রয়েছেন।" [সূরা বাকারা : ১৫৩]

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ "আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম আমল-কারীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।" [সূরা তাওবা : ১২০]

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্থায়িত্ব ও ধ্বংসের সাধারণ নিয়ম ও চূড়ান্ত নীতির বিবরণ দিতে গিয়ে অধিক যোগ্যতর বস্তুর স্থায়িত্বের পরিবর্তে যে বস্তুর মাঝে মৌলিকত্ব, বাস্তবসম্মত ও কল্যাণ সাধনের যোগ্যতা থাকে, কেবল তাই স্থায়ী থাকে এবং দুনিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। আর যে বস্তু অন্তঃসারশূন্য ও অকল্যাণকর, তা ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যায় :

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ۔

"আর পানির উপরে থাকা ফেনা অকেজো হয়ে যায়। আর যা মানুষের জন্য কল্যাণকর তা যমীনে বিদ্যমান থাকে। এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা উদাহরণ বর্ণনা করেন।" [সূরা রা'দ : ১৭]

উল্লিখিত আল্লাহ্র বিধানের আলোকে সৃষ্টিগত ও প্রকৃতিগতভাবে ইসলাম যখন একটি গঠনমূলক ও বৈপ্লবিক জীবনদর্শন এবং পরিপূর্ণ আদর্শ জীবন ব্যবস্থার আকারে এসেছে, তখন তা কুফর ও শিরক, জাহিলিয়ত ও মূর্খতা, বস্তুবাদ ও লৌকিকতা পূজা, জাতিগত ও গোষ্ঠীগত পক্ষপাতিত্ব, মানব দুশমনী,

সাম্রাজ্যবাদ ও শ্রেণী-বৈষম্য, ধর্ম ও পার্থিব জগতকে পৃথকীকরণ ও অশোভন দুর্দান্ত আচরণ এবং সকল অমানবীয় চিন্তা-চেতনা ও কার্যকলাপকে রহিত করেছিল এবং সুদৃঢ়ভাবে মানুষের জন্য তাওহীদ ও রিসালত, ঈমান ও ইয়াকীন, আমলের প্রতিদান এবং আখিরাতের বিশ্বাস, উন্নত আদর্শ ও নেক আমল, জ্ঞানপ্রীতি ও দূরদর্শিতা, আল্লাহ্-ভীতি ও রূহানিয়ত বাস্তববাদিতা ও সত্যপ্রিয়তা, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্য ও মানবতাবাদ এবং মানুষের সম্মান-সম্ভ্রম ও নারীর অধিকার সংরক্ষণ, দ্বীন ও দুনিয়ার সমন্বয় এবং একটি কল্যাণকর সমাজ ও সভ্যতা এবং একটি বিশ্বজনীন মানব সভ্যতার পূনর্গঠন ও রূপায়নের পথ সুগম করে দেয়; আর তা সূর্যের রশ্মি ও চাঁদের কিরণ এবং ঋতুর পরিবর্তনের ন্যায় গোটা মানবতার জগতকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়।

ইসলামী শিক্ষার কারণে এমন এক অতুলনীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি অস্তিত্ব লাভ করল যার ভৌগোলিক পরিসীমা পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তার সময়কাল চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত ব্যাপৃত। আর এ স্থান ও সময়ের ব্যাপকতা এবং এ সভ্যতার বিশাল সম্ভাবনা ও তার সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদী উপাদান ও অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ প্রায় সকল মানবীয় সভ্যতাকে কমবেশি প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। ক্রুসেড যুদ্ধ, কনস্টান্টিনোপল বিজয় (১৪৫২ খ্রি.), অতঃপর স্পেনের ইসলামি শাসনের মাধ্যমে ইসলামি সভ্যতা পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও কারিগরি বিদ্যার উন্নতির ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে প্রভাব ও কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল, তার স্বীকৃতিতে নিকট অতীতে ও বর্তমানে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে গুস্তাভ লিবয়ন রচিত 'আরব সভ্যতা' রবার্ট ব্রিফল্ট (Robert Briffault) রচিত 'মানবতার পুনর্গঠন' (Making of Humnnity), টয়েনবী (A. J. Toynbee) রচিত 'স্টাডি অব হিস্ট্রী, জর্জ সার্টেন রচিত 'হিস্ট্রী অব সায়েন্স' (History of Science) এবং ড. তারাচাঁদ রচিত ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব (Influence of Islam in Indian Culture) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উর্দু ভাষায় এ বিষয়ে হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ)-এর জীবন্ত গ্রন্থ 'ইনসানী দুনিয়া পর মুসলমানুঁ কে উরূয ও যাওয়াল কা আছর' (মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারাল) সর্বপ্রথম গ্রন্থ ছিল। উক্ত গ্রন্থটি এ বিশাল বিস্তৃত গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক বিষয়ের হক আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল এবং বিষয়ের গুরুত্ব, মূল্য ও মূল্যায়নের বিচারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মনোযোগের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে– যার কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে

এভাবে যে, গ্রন্থটির আরবি ও উর্দুতে এক ডজনের বেশি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায়ও কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। আর বিজ্ঞজনেরা তা থেকে সর্বদা উপকৃত হচ্ছেন। হযরত মাওলানা (রহ) রচিত উক্ত গ্রন্থের সাথে কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন গ্রন্থ اثره في الحضارة الاسلام : وفضله على الانسانية এর উর্দু অনুবাদ লেখকের কলম থেকে প্রকাশ হতে যাচ্ছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিতভাবে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইসলামের অনস্বীকার্য অবদান এবং সুদূরপ্রসারী-দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ও প্রভাবের বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানগর্ভ ও ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততা, চিন্তাগত ও গবেষণামূলক স্বচ্ছতা এবং ঈমানী অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞার সাথে আলোচনা করা হয়েছে। এতে একটি বিশাল-বিস্তৃত জ্ঞানসাগরকে এবং অসংখ্য শাখা-প্রশাখা সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক বিষয়কে দশটিমাত্র মৌলিক শিরোনামে সংকুচিত করা এবং দরিয়াকে একটি কলসে ভরার মত এমন ঐতিহাসিক দক্ষতাপূর্ণ ও বিজ্ঞোচিত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে– যা কোন প্রকার বিভেদ ছাড়াই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল ইতিহাসবিদ, গবেষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ক বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, ধর্ম ও সংস্কৃতির তুলনামূলক পর্যালোচনাকারী গবেষক এবং সকল চিন্তাবিদ ও অনুসন্ধানী ব্যক্তিদের জন্য সাধারণ ঘোষণা ও চিন্তা-ফিকিরের দাওয়াতনামার ভূমিকা পালন করছে। মুসলিম ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ গ্রন্থের চিন্তার দ্বার উন্মোচনকারী বিষয়গুলোকে নিজেদের গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে এবং তার মাঝে আরো ব্যাপকতা সৃষ্টি করে বর্তমান যুগে ইসলাম ও মুসলমানদের বৃহৎ খিদমত আঞ্জাম দিতে সক্ষম এবং তারা ইলমী ও গবেষণার জগতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অনেকটা অজ্ঞাত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবেন।

গ্রন্থের বিষয়বস্তুগুলো শুধুমাত্র ঐতিহাসিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে নয়, বরং এতে বর্তমান যুগের সমস্যা ও সংকটসমূহের সমাধান পেশ করা হয়েছে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার আঘাতে জর্জরিত ও তার অত্যাচারে পিষ্ট, নিজের বর্তমান অবস্থানে অসন্তুষ্ট ও ভবিষ্যতের ব্যাপারে হতাশ মানুষগুলোর মাঝে সাহস ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে এবং জাতিগত পক্ষপাতিত্ব ও গোষ্ঠীগত ভেদাভেদকে অভিশাপ আখ্যায়িত করে ইসলামি-ভ্রাতৃত্ব, সাম্য এবং তার উদ্ভাবিত বিশ্বজনীন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐক্যের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে– যাতে এর মাধ্যমেই মানুষ ইজ্জত-সম্মান ও মর্যাদার ঊর্ধ্বজগতে পৌঁছতে সক্ষম হয়। আর নারী জাতি নিজের সৃষ্টিগত মর্যাদা ও সকল প্রকার অধিকার পেতে সক্ষম হয়। এর পাশাপাশি তাওহীদের বিশ্বজনীন প্রভাব এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আকল-বুদ্ধির

প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং বিজ্ঞানকে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে কল্যাণকর ও আল্লাহ্-ভীতির মাধ্যমে পরিণত করার প্রতি উৎসাহ পাওয়া যেতে পারে। পরিশেষে তাতে মুসলিম উম্মাহকে ইসলামের ঐ সকল মহৎ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা এবং সঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী দুনিয়ার পথপ্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ, বিশ্বব্যবস্থা ও আখলাক-চরিত্রের বিচার, সামাজিক ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং সত্যের সাক্ষ্য প্রদানের দায়িত্ব পালনের জোরালো ও নিষ্ঠাপূর্ণ দাওয়াত দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে নিজেদের ধর্মীয় ও জাতীয় দায়িত্ব পালনের জ্ঞান, দৃষ্টিশক্তি ও সাহস দান করুন এবং সাধারণ মানুষকে এ সকল আলোচিত বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও আমল করার তাওফীক দান করুন।

ایں دعاز من واز جملہ جہاں امیں باد

এ দু'আ আমার পক্ষ হতে; আর গোটা বিশ্ব– আমীন বলেছে–

ایں دعاز من* واز جملہ جہاں امیں باد

শামস তাবরীয খান

১২ই রবিউস্‌সানী ১৪০৬ হি. সদস্য,

১৫/১২/১৯৮৫ খ্রি. মজলিসে তাহকীকাত ও নাশরিয়াতে ইসলাম

ভূমিকা

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔

হিজরী পনের শতাব্দীকে স্বাগত জানানো উপলক্ষে (যাকে মুসলিম বিশ্ব বিভিন্নভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে উদযাপন করেছিল)।[১] কুয়েতের তথ্য মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি বিভাগ বিষয়টি উদযাপনের জন্য একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিল এবং লেখককে الاسلام والحضارة الانسانية (ইসলাম ও মানব সভ্যতা) বিষয়ে নিজস্ব মতামত পেশ করার জন্য দাওয়াত করেছিল। এ দাওয়াতের সাথে লেখক স্বভাবগত ও চিন্তাগত সামঞ্জস্য অনুভব করেন। ফলে, লেখকের উপর এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং ইতিবাচক সাড়া পায়। কারণ, তার কাছে বিষয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের অনুভূতি ছিল এবং এ বিষয় ও উদ্দেশ্যের সাথে তার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। ফলে, তাতে প্রয়োজন মত আরো চিন্তা-ভাবনা ও অধ্যয়ন করে আরো কিছু সংযোজন করা সম্ভব ছিল। তাই তিনি কৃতজ্ঞতার সাথে দাওয়াত কবূল করেন এবং অত্যন্ত কর্মব্যস্ততা ও বেশ কিছু সফরসূচি থাকা সত্ত্বেও অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রস্তুত করতে সক্ষম হন।

অনুষ্ঠানটি কুয়েত সরকারের প্রচার ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ হলে ১৮ই সফর ১৪০৪ হিজরী মুতাবিক ২৩শে নভেম্বর ১৯৮৩ খ্রিঃ বুধবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সে দেশের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি এবং উচ্চশিক্ষিত যুবক শ্রেণীর এক বিরাট সংখ্যক উপস্থিত ছিল। এ প্রবন্ধটিই মক্কা মুকাররমাতে অবস্থিত النادى الثقافى নামক একটি বিশাল সমাবেশে ৩০শে সফর ১৪০৪ হিজরীতে (৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৪

---

১. এ উপলক্ষে ঐ জলসার আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য– যা ভারতের মুসলিম ছাত্র সংগঠন (S. I. M)-এর উদ্যোগে ২২শে যিলহজ্জ ১৪০০ হিজরীতে লক্ষ্ণৌয়ের গঙ্গা প্রসাদ মেমেরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তার একটি সুন্দর স্মারক ছিল লেখকের একটি বক্তৃতা যা 'পনের শতাব্দী হিজরী : অতীত ও বর্তমান-এর আয়নাতে' শিরোনামে উর্দু, আরবি ও ইংরেজিতে প্রকাশ করা হয়েছিল। আর আরব বিশ্ব ও হিন্দুস্থানের ধর্মীয় ও জ্ঞানী মহলে তা বিশেষভাবে সমাদৃত ও গৃহীত হয়েছিল।

খ্রিঃ) পাঠ করা হয়। পরবর্তীতে তা احاديث ضريحة مع اخواننا العرب والمسلمين নামক সংকলন গ্রন্থের সাথে প্রকাশিত হয়।[১]

কিন্তু উল্লিখিত প্রবন্ধ (মৌলিক আলোচনা ও চিন্তাশীল বিষয়সমূহের দিকে ইঙ্গিত করার প্রেক্ষিতে) সময় স্বল্পতা ও অধিক ব্যস্ততার কারণে তা অতি সংক্ষিপ্তভাবে লেখা হয়েছিল। অতঃপর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত সীরাত ও সুন্নাহ-এর চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সচিবালয়ের পক্ষ থেকে লেখককে দাওয়াত দেয়া হয়। ঘটনাক্রমে তার আলোচ্য বিষয়ের তালিকাতে اثر الرسالة الاسلامية فى الحضارة الانسانية। (মানব সভ্যতায় নবূয়তে মুহাম্মদীর প্রভাব) নামে একটি শিরোনাম ছিল। ফলে, এ দাওয়াতনামা উক্ত বিষয়ের উপর আরো বেশি গবেষণা ও সংযোজন করার উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং এ বিষয় থেকে একবার মানসিকভাবে সরে আসার পর পুনরায় তা চিন্তা-চেতনায় ও মন-মস্তিষ্কে ভর করে (স্বীয় গবেষণা ও লেখালেখির জীবনে এ অভিজ্ঞতা বার বার হয়েছে)। ফলে, আবার নতুন করে এ বিষয়ে চিন্তা-ফিকির শুরু হলো। মূল শিরোনামের অধীনে উপ-শিরোনাম প্রস্তুত করা হয় এবং বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ও বিশ্বসভ্যতায় ইসলামের সুস্পষ্ট প্রভাব ও মুহাম্মদ (সা)-এর নবূয়তের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক অবদানসমূহ প্রসঙ্গে পাওয়া নতুন নতুন তথ্যসমূহ, শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ এবং অমুসলিম পন্ডিতদের সাক্ষ্যসমূহ প্রবন্ধটিকে সাদা-মাটা লেখার স্তর হতে উন্নত করে একটি নতুন গবেষণামূলক বিষয় এবং তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক আলোচনার রূপ দান করেছে। ফলে, তা মুসলিম ও অমুসলিম ইনসাফপ্রিয় গবেষকবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং তা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদযোগ্য ও শিক্ষিত মহলে পেশ করার উপযুক্ত বানিয়ে দিয়েছে। যাদের মধ্যে সবসময় সত্য গ্রহণ করা, তার স্বীকৃতি প্রদান, উদার মনে গ্রহণ করা এবং প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গির গুণ পাওয়া যায় এবং তা থেকে কোন যামানাই শূন্য ছিল না।

লেখক এ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ও বেমানান বিনয় অবলম্বন করেননি। ফলে, তিনি স্বীয় পূর্ব রচনা থেকে উদ্ধৃতি উপস্থাপন করতে দ্বিধাবোধ করেননি; বরং তিনি স্বীয় রচনা হতে ঐ সকল নির্বাচিত অংশ উল্লেখ করেছেন– যা ঐ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও তত্ত্বকে উত্তম পন্থায় পেশ করে– যা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। প্রত্যেক গ্রন্থকার ও লেখকের অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি,

---

১. পৃষ্ঠা ৬৩-৮০, দারে আরাফাত, রায়বেরেলী কর্তৃক মুদ্রিত।

কলমের গতি, মনের উদ্দীপনা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার মত বস্তু নয় যে, তা সব সময় অর্জিত হয়। তাই লেখক যদি নিজের সাবেক ভান্ডার থেকে কখনো কল্যাণকর ও কার্যকর অংশ পেশ করেন, তাহলে তা লেখকের পক্ষে দোষের কিছু নয়। সুতরাং পাঠক এখানে এমন কিছু আলোচনা দেখতে পাবেন– যা 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারাল' বা 'নবীয়ে রহমত' বা অন্য কোন গ্রন্থে পড়ে থাকবেন। কিন্তু নতুন সংকলন বিন্যাস ও সংযোজনের কারণে পুস্তিকা বা প্রবন্ধটি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের রূপ লাভ করেছে এবং বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্টতা, সামঞ্জস্য ও স্বকীয়তার কারণে তা এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। গ্রন্থকার যখন কায়রোর 'সীরাত ও সুন্নাহ' শীর্ষক চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের বিলম্ব হওয়ার খবর পান, তখন তিনি এ বিষয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার সুযোগ পান, তখন তিনি এ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা, চিন্তা ও বস্তুনিষ্ঠ দাওয়াতের যোগ্যতা ও বিষয়টিকে সামনে অগ্রসর করা এবং তার হক আদায় করার এ বিপ্লবী আবেদনের কারণে– যা তার মাঝে নিহিত রয়েছে– এ গ্রন্থটিকে প্রকাশ করা অনিবার্য মনে করলেন।

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ "সরল পথ আল্লাহ্‌র কাছেই পৌঁছায়।"

[সূরা নাহল : ৯]

লেখক স্বীয় স্নেহভাজন ও সহযোগী মৌলভী শামস তাবরীযকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন। কারণ, তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে বইটি উর্দু ভাষায় ভাষান্তর করেছেন এবং এতে উদ্ধৃত গ্রন্থ তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করেছেন– যা তিনি আরবি থেকে উর্দুতে তরজমা করেছেন।

১৯শে শাওয়াল ১৪০৫ হিজরী
৮ই জুলাই ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ

আবুল হাসান আলী নদভী

বিশ্ব-সভ্যতায় ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (সা)

বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি

ইসলাম ও মানব সভ্যতা-সংস্কৃতি একটি জীবন্ত ও বাস্তবসম্মত বিষয়– যার সম্পর্ক কেবল মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত এবং ইসলামের পয়গাম ও শিক্ষার সাথেই নয় বরং জীবনের বাস্তবতা, মানবতার বর্তমান ও ভবিষ্যত এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির পুনর্গঠন ও দিকনির্দশনার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর ঐতিহাসিক ভূমিকার সাথেও রয়েছে। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই মূলত একক প্রচেষ্টার পরিবর্তে সম্মিলিত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টার দাবিদার। কারণ, এ বিষয়টি তার বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার দিক থেকে বিশ্বজনীন ও মানবীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং তা নিজের ভিতরে গভীরতা ও ব্যাপকতা, ব্যাপক প্রশস্ততা ও বিস্তৃত পরিসর ধারণ করে রেখেছে। তার সময়কাল হলো প্রথম ইসলামি শতাব্দী থেকে শুরু করে আমাদের বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত। আর তার ভৌগোলিক অবস্থান হলো পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। আর তার মর্মগত ব্যাপকতা হলো আকীদা-বিশ্বাস থেকে শুরু করে চরিত্র ও কর্ম পর্যন্ত, ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে রাজনৈতিক, সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যন্ত এবং চিন্তা-দর্শন, শিক্ষা, ও নৈতিকতার সংশোধন ও উন্নয়ন থেকে শুরু করে নির্মাণশিল্প, কাব্য-সাহিত্য, শিল্পকলা পর্যন্ত ব্যাপৃত ও বিস্তৃত।

এর সাথে সাথে তার প্রতিটি পরিধি ও বিস্তৃতি বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট বলে প্রমাণিত হয়েছে। এজন্য এ বিষয়বস্তুর দায়িত্ব কেবল এমন একটি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান এবং একটি একাডেমী আঞ্জাম দিতে সক্ষম– যা উক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও গবেষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত। এ বিষয়বস্তুর জন্য সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের প্রয়োজন– যারা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এবং নিজেদের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা অর্জিত ফলাফলের নির্ভীক ঘোষণা দেবার যোগ্যতা ও সক্ষমতা রাখেন। তাদের কেউ আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করবেন, দ্বিতীয় দল সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সামাজিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করবেন, তৃতীয়রা করবেন শরীআত ও আইন-কানুন-সংবিধান নিয়ে গবেষণা। চতুর্থগণ ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানবতার সাম্য-সম্প্রীতির জ্ঞানগর্ভ ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

করবেন– যা ইসলামের ধর্ম-বিশ্বাস। পঞ্চমদল ইসলামের ঐ সকল ভূমিকা ও অবদানের উপর আলোকপাত করবেন– যা ঐ সমাজজীবনে নারীদেরকে তাদের বৈধ অধিকার প্রদান করার ক্ষেত্রে এবং তাদের সঠিক অবস্থান নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে পালন করেছে। এভাবে এ বিষয়বস্তুটি একটি স্বতন্ত্র বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়া হবার দাবি রাখে। তারপরেও যেমনটি বলা হয়ে থাকে যে, ما لا يدرك كله لا يترك كله (যার পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব নয়, তা একেবারে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়)। আর এ কারণেই এ শূন্যতা পূরণ করার সাহসিকতা প্রদর্শন করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মাটির এক প্রকারের আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে–

فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ

"সেখানে যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও পৌঁছে, তবু তার জন্য হালকা শিশিরই যথেষ্ট।" [সূরা বাকারা : ২৬৫]

অত্যন্ত কঠিন ও নাজুক কাজ

সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন ও নাজুক কাজ হলো কোন উন্নত সভ্যতার অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা– যার মাধ্যমে ঐ সভ্যতার অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহের বিভিন্ন যুগ ও ঐতিহাসিক অবস্থান সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, তার শিকড় সন্ধান করা যেতে পারে, তার পারস্পারিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া লেন-দেন এবং ঐ সভ্যতার মৌলিক ও বস্তুনিষ্ঠ উপাদানসমূহ (Factors) চিহ্নিত করা যেতে পারে। আর সেটাও ঐ অবস্থায় যখন ঐ সকল উপাদান ও প্রতিক্রিয়া একটি সভ্যতার রূপ ও মানব সমাজের আকৃতি ধারণ করে এবং গর্ভে প্রবেশ করে তার রক্ত ও প্রাণের অংশে পরিণত হয়েছে। এভাবে তা দ্বারা এ সংস্কৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। যেমন স্বভাবগত বৈশিষ্টসমূহ, শিক্ষা-দীক্ষা, পরিবেশ ও খাদ্যের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির জীবনও বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু এখনো তার পর্যবেক্ষণের জন্য কোন গবেষণা ল্যাব গড়ে উঠেনি– যা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের কাজ করতে সক্ষম। অথবা এখনো কোন অণুবীক্ষণ যন্ত্রও আবিষ্কার হয়নি– যা সভ্যতার ঐ সকল সূক্ষ্ম উপাদানকে নিরীক্ষণ করে প্রকাশ করতে সক্ষম– যা কোন সভ্যতার অবকাঠামো রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

এ অবস্থায় জাতি-গোষ্ঠী, বিভিন্ন দেশ ও সমাজের ব্যাপক বিস্তৃত গবেষণা প্রয়োজন হয়ে পড়ে– যা দ্বারা আমরা তার অতীত ও বর্তমানের পর্যালোচনা

করতে পারি এবং ইসলামি দাওয়াত ও মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তের বিপ্লবী ও সংস্কারমূলক কর্মের পরিধি সম্পর্কে অনুমান করতে পারি– যা তার আকীদা-বিশ্বাসের সংস্কার ও পরিবর্তন, জাহিলিয়াতের প্রভাব, শিরকী চিন্তা-দর্শন, পৈতৃক রেওয়াজ-প্রথা মিটাবার ক্ষেত্রে এবং চিন্তাধারার গতি ঘুরিয়ে দিতে, মূল্যবোধ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিবর্তন করতে এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির পুনর্গঠন ও তার শ্রীবর্ধন করার ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা পালন করেছে। বস্তুত এ কাজ মরণপণ গবেষণা ও অত্যন্ত মেধা ও বুদ্ধিগত সাধনার দাবি রাখে। তারপরেও এটি বাস্তবসম্মত, কল্যাণকর ও জরুরী পদক্ষেপ। এটি যদি ইউনেস্কো-এর মত কোন গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান অথবা আমেরিকা-ইউরোপের কোন শিক্ষা একাডেমী না করে, তাহলে এ জন্যে প্রাচ্যের মুসলিম দেশের কোন শিক্ষা ও গবেষেণা কেন্দ্র অথবা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শিক্ষা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ কাজ অনেক শিক্ষামূলক কাজের তুলনায় বেশি কল্যাণকর ও কার্যকরী– যা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ আঞ্জাম দিচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে তারা নির্দ্বিধায় নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ও উপকরণসমূহ ব্যয় করছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) ও ফলপ্রসু কর্মের সীমাবদ্ধকরণের জটিলতা

মানব সভ্যতায় ইসলামের অবদানকে নির্ধারণ ও সীমাবদ্ধ করা একটা মুশকিল ও প্রায় অসম্ভব কাজ। কারণ, তাঁর প্রভাব ও অবদান মানব সভ্যতার অস্তিত্ব ও তার অস্থি-মজ্জার অংশে পরিণত হয়েছে এবং বর্তমানে তা মানব সভ্যতার রক্তে এভাবে মিশে গেছে যে, দুনিয়ার জাতি-গোষ্ঠী তার প্রভাব নির্ণয় করতে সক্ষম হবে না বা তারা কখনো কল্পনা করতেও সক্ষম হবে না যে, এ সকল প্রভাব তাদের কাছে বাইরে থেকে আগমন করেছে এবং তা কোন বিশ্বজয়ী দ্বীনি দাওয়াত ও তার বিপ্লবের ফসল। কারণ এখন তা ঐ সভ্যতার অস্তিত্ব ও তার চিন্তা-চেতনা, সংস্কৃতি ও জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) ও ইসলামের বিশ্বজনীন প্রভাব

এখানে লেখক স্বীয় গ্রন্থ 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারাল?' থেকে একটি উদ্ধৃতি পেশ করছেন যাতে তিনি ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং মানব চিন্তা-চেতনায় তার প্রভাব সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন।

"যেভাবে বসন্ত মৌসুমে উদ্ভিদ জগত ও মানুষের মেজায মৌসুম দ্বারা প্রভাবিত হয়, ঠিক তেমনি অনুভূত ও অনঅনুভূত পন্থায় মুসলিম শাসন ও

সভ্যতার যুগে মানুষের মন-মানসিকতাও পরিবর্তিত ও প্রভাবিত হতে থাকে, চিত্তে কোমলতা ও নম্রতা সৃষ্টি হতে থাকে, ইসলামের মৌল নীতিমালা ও সত্যবাণী মন ও মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হতে থাকে। বস্তুর মূল্য ও মান সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে থাকে। গতকাল পর্যন্ত যেসব বস্তু ও গুণাবলী মানুষের দৃষ্টিতে বিরাট মর্যাদাপূর্ণ ও গুরুত্ববহ বলে বিবেচিত ছিল, আজ আর তা তেমন থাকল না। আর যেসব বস্তু গুরুত্বহীন ও মূল্যহীন ছিল, আজ তা গুরুত্ববহ ও মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হলো; পুরাতন মূল্যবোধের স্থলে নতুন মূল্যবোধের অনুভূতি জাগ্রত হলো। প্রবৃত্তি পূজারীদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ সৃষ্টি হলো। ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, এর অভ্যাস, রীতিনীতি ও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ এখতিয়ার করা গর্বের ব্যাপারে হয়ে দাঁড়ায়। দুনিয়া ক্রমান্বয়ে ইসলামের নিকটতর হচ্ছিল, পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী মানুষ যেমন সূর্যের আবর্তন-বিবর্তন সম্পর্কে অনুভব করতে পারে না, ঠিক তেমনি পৃথিবীর জাতিগোষ্ঠী ও এর মানুষগুলো নিজেদের ইসলামি প্রবণতা ও ইসলামের অভ্যন্তরীণ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনুভব করতে পারত না। জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন-ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতি কোন কিছুই এর প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। মানুষের বিবেক ও তার অন্তর এসব প্রভাবের সাক্ষ্য দিত এবং তাদের সুকুমার বৃত্তিতে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মুসলমানদের পতনের পরও যেসব সংস্কার আন্দোলন ঐসব জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হয়, তা ইসলামি প্রভাব ও ইসলামি ধ্যান-ধারণারই ফলস্বরূপ।[১]

পৃথিবীর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) ও ইসলামের দশটি মৌলিক অবদান

জাতি-গোষ্ঠীর জীবনে এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব-সমূহকে নির্ধারণ করা এবং তাকে সীমাবদ্ধ করা যদিও অসম্ভব ব্যাপার, তদুপরি আমরা সংক্ষেপে ও নির্বাচন করে তাকে দশটি মৌলিক ও মূল্যবান অবদান হিসেবে নির্ধারণ করার চেষ্টা করব– যা মানব জাতির জন্য দিকনির্দেশনা, তার কল্যাণ ও সফলতা, তার গঠন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে এবং একটি জীবন্ত ও উজ্জীবিত পৃথিবী গড়তে ও এর রূপদান করতে সফলতা অর্জন করেছে; আর তা পচনশীল ও বিধ্বস্ত। দুনিয়ার সাথে কোন প্রকার সাদৃশ্য রাখে না। নিম্নে ঐ সকল মূল্যবান অবদান উল্লেখ করা হলো :

১. স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট একত্ববাদের ধারণা;

২. মানবীয় ঐক্য ও সাম্যের ধারণা;

---

১. মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারাল, পৃঃ ১৫০-১৫১

৩. মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা;

৪. নারীর সামাজিক মর্যাদা ও তার অধিকার পুনরুদ্ধার;

৫. হতাশা ও কুধারণার পরিবর্তে হৃদয়ে হৃদয়ে ছেয়ে গেল আশা-আকাঙ্ক্ষার আলো;

৬. দ্বীন ও দুনিয়ার সমন্বয় এবং বর্ণবাদ ও শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রেণী বৈষম্যের অপসারণ;

৭. জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের পবিত্র ও স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন এবং একের ভাগ্যকে অপরের ভাগ্যের সাথে জুড়ে দেয়া, জ্ঞানের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং একে উদ্দেশ্যপূণ, উপকারী ও আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের মাধ্যম বানানোর প্রশংসিত উদ্যোগ;

৮. জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা ধর্মীয় বিষয়ে উপকৃত হওয়া এবং জীবন ও মহাকাশ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার প্রতি উৎসাহদান;

৯. মুসলিম উম্মাহকে বিশ্বনেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যাক্তিগত ও সামষ্টিক চরিত্র মানুষিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সমীক্ষা, পৃথিবীতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং সত্যের সাক্ষ্যের যিম্মাদারী গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা;

১০. আকীদা-বিশ্বাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশ্ব ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।

এগুলোর প্রতিটি বিষয়ই ব্যাপক-বিস্তৃত এবং প্রতিটি বিষয়ের রয়েছে সুদীর্ঘ শাখা-প্রশাখা। এ বিষয়গুলো মুহাম্মদ (সা)-এর নবূয়তপূর্ব জাহিলী যুগ ও সভ্যতা-সংস্কৃতিসমূহ এবং ইসলামের আবির্ভাবের যুগ, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থার মাঝে বস্তুনিষ্ঠ ও ইনসাফের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনার দাবি রাখে এবং এর প্রতিটি বিষয়ের জন্যই হাজার হাজার পৃষ্ঠার স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা প্রয়োজন।

এখন আমি মানব জীবনের ঐ সকল অংশের পৃথক পৃথক আলোচনা করব যাদ্বারা ইসলামের মৌলিক ও বিপ্লবী প্রভাবসমূহ সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় এবং তা দ্বারা ইসলামের বৈপ্লবিক ব্যাপকতা এবং অভ্যন্তরীণ শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

তাওহীদের স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন আকীদা-বিশ্বাস

রাসূলে আকরাম (সা)-এর মহাঅনুগ্রহ

এখানে আমি ইসলামের প্রথম দান মুহাম্মদ রাসুল (সা)-এর মহা অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করছি। তা হলো, তিনি বিশ্বমানবতাকে দান করেছেন নির্ভেজাল মূল্যবান তাওহীদের আকীদা-বিশ্বাস– যা স্বচ্ছ, পবিত্র ও নজীরবিহীন এক মূল্যবান বিপ্লবী আকীদা; শক্তি ও বিশ্বাসে ভরা জীবনবোধ থেকে উৎসারিত। এই আকীদা পাল্টে দেয় সব প্রতিকূলতা, বাধা-বিপত্তি; বিলীন করে দেয় বাতিল প্রভুদের রাজত্ব। এটা এমন এক আকীদা-বিশ্বাস– যা বিশ্বমানবতা না ইতিপূর্বে পেয়েছিল আর না কিয়ামত পর্যন্ত পাবে।

মানব জীবনে শিরিক ও মূর্তিপূজার প্রভাব প্রভাবান্বিত সেইসব মানুষ যারা কবিতা ও দর্শন, রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের বিষয়ে বড় বড় বড়ত্বের দাবি করে, চমৎকার বুঝ-সমঝের অধিকারী, যারা দেশ ও জাতিকে অসংখ্যবার গোলামে পরিণত করেছিল, যারা কঠিন শিলা-পাথরকে প্রস্ফুটিত ঘ্রাণযুক্ত পুষ্পে পরিণত করেছিল, যারা মরুর পাহাড়ের বুক দিয়ে বইয়ে দিয়েছে কত প্রবহমান ঝর্ণাধারা, এরা কখনো কখনো নিজেকে আল্লাহ্ বলেও দাবি করে বসেছিল। এই মানুষই আবার অতি নগণ্য জড় বস্তুর সামনে মাথা অবনত করত, যার নেই উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা, আর না আছে কাউকে কিছু দেয়া বা না দেয়ার ক্ষমতা। পবিত্র কুরআনে এ মর্মে বর্ণিত হচ্ছে :

وَإِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ط ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ۔

"এবং যদি মাছি তাদের সামনে থেকে কোন জিনিস ছিনিয়ে নেয়, তাহলে তারা মাছির কবল হতে তা উদ্ধার করতে পারে না। এমন তালেব (উপাসক) এবং মাতলূব (উপাস্য) কতই দুর্বল!" [সূরা হাজ্জ : ৭৩]

এ মানুষই এমন বস্তর সামনে মাথানত করত, তাকে ভয় করত এবং তার কাছেই কল্যাণের আশা করত, যাকে সে নিজেই তৈরি করেছে। মানুষ শুধু পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, গাছ-পালা, জীব-জন্তু, আত্মা-প্রেতাত্মা, মানুষ ও শয়তানের সামনেই সিজদায় লুটিয়ে পড়ত না, বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতি নগণ্য কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড়কেও সিজদা ও আরাধনা করত। তারা সারা জীবন অতিবাহিত করত কুমন্ত্রণা, সন্দেহ, অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনায়, অবাস্তব ধ্যান-

ধারণায়, নিরর্থক আশা-আকাঙ্ক্ষায়– যার স্বাভাবিক পরিণতি হলো তার মধ্যে কাপুরুষতা ও দুর্বলতা, চিন্তা-চেতনার দীনতা ও মানসিক অস্থিরতা, আত্মবিশ্বাসশূন্যতা ও অস্থিতিশীলতার মত অসংখ্য রোগ-ব্যাধি তাকে গ্রাস করে ফেলে। সনাতন ভারতবর্ষে দেব-দেবীর আধিক্য বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। যখন ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তা পূর্ণতার শেষ সোপানে পা রেখেছিল, তখন তাদের মাবূদ-ভগবানের সংখ্যা তেত্রিশ কোটিতে উন্নীত হয়েছিল[১] এবং প্রতিটি পছন্দনীয় বস্তু, প্রতিটি ভয়ঙ্কর বস্তু, বাহ্যত কল্যাণকর জিনিসমাত্রই পূজার যোগ্য মনে করা হত। (বিশ্ব কি হারাল পৃ. ৫৭)

একত্ববাদের বিশ্বাস ও জীবনের উপর-এর প্রভাব

পবিত্র কুরআন এবং মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালাত এ ঘোষণা দিল যে, এ দুনিয়া মালিকবিহীন বা অসংখ্য মালিকের এজমালী সম্পত্তি নয়, বরং এর বাদশাহ মাত্র একজন, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই নির্মাতা এবং তিনিই এর পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। সৃষ্টি করা ও নির্দেশ দান করার অধিকার একমাত্র তাঁরই। اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ "জেনে রাখ, সৃষ্টি করা তাঁরই কাজ এবং আদেশ দেয়াও তাঁরই কাজ।" [সূরা আ'রাফ : ৫৪]

এ দুনিয়ার ছোট-বড় সকল বস্তুই তাঁর হুকুম ও কুদরতের দ্বারা আপন অস্তিত্ব লাভ করে। বস্তুত প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বের প্রকৃত কারণ হলো আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও তাঁর কুদরত। অনুরূপ, এ বিশ্বজগতও তাঁর সৃষ্টি ও অস্তিত্ব লাভের জন্য তাঁর হুকুম ও আদেশের মুখাপেক্ষী। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"আসমান ও জমীনের মাঝে যা কিছু আছে সবই তাঁর সামনে আত্মসমর্পণ-কারী।" [সূরা আলে ইমরান : ৮৩]

আর এজন্যই যেসব মাখলূক নিজস্ব ইচ্ছা ও এখতিয়ারের মালিক, তাদেরও তাঁর হুকুমের সামনে মাথানত করা উচিত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ـ

"জেনে রাখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।" [সূরা যুমার : ৩]

---

১. R. C. Dutt. Ancient India. Vol. III. P. 276. (1891) And L. S. S. D. Malley : Popular Hinduism-The religon of Masses (cambridge. 1935)

মানুষের উপর এ আকীদা-বিশ্বাসের প্রথম মানসিক প্রতিক্রিয়া এ হল যে, (মানুষ বুঝতে সক্ষম হলো) এ বিশ্ব একক কেন্দ্র ও একই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। আর এ নিয়মের মাঝে মানুষ তার বিস্তৃত সদস্যদের মধ্যে অটুট বন্ধন ও সুগভীর সম্পর্ক খুঁজে পেল। এ আকীদা-বিশ্বাসের প্রভাবে মানুষ জীবনের পরিপূর্ণ অর্থ খুঁজে পেল এবং সৃষ্টি সম্পর্কে হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে সুনির্দিষ্ট মতামত পোষণ করতে সক্ষম হলো।

রাসূলুল্লাহ (সা) বিশ্বমানবতাকে দান করলেন সহজ, স্বচ্ছ, সুন্দর-পবিত্র, গ্রহণযোগ্য, প্রাণ সঞ্জীবনী সাহস ও হিম্মতে ভরপুর জীবন ও শক্তিসঞ্চারী এক আকীদা, যার মাধ্যমে মানবতা পেল নবজীবন। ফলে, তারা নিষ্কৃতি পেল তাগূতের ভয় ও শংকা হতে। তখন এক আল্লাহ্‌কে ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করার প্রয়োজন আর রইলো না। তাদের অন্তরে এখন এমন ইয়াকীন পয়দা হলো যে, এক আল্লাহ্‌ই ক্ষতি করেন এবং কল্যাণ দান করেন, দানও করেন, বিমুখও করেন। তিনিই মানুষের প্রয়োজন পূরণকারী। তাওহীদের এ নতুন পরিচয় এবং নতুন আবিষ্কারের কারণে দুনিয়ার ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল। তারা সব ধরনের গোলামী থেকে, মাখলূকের ভয় ও আশা এবং মন ও মগজের পেরেশানী থেকে মুক্ত হয়ে গেল। তারা এখন আধিক্যের মাঝে একত্ববাদের সন্ধান খুঁজে পেয়েছে। সৃষ্টিলোকের মাঝে তারা নিজের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মাঝে তারাই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি; আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পৃথিবীর শাসক ও ব্যস্থাপক এবং আল্লাহ্‌র খলীফা পদমর্যাদায় ভূষিত। এখন তারা নিজেদের প্রকৃত স্রষ্টা ও প্রভুর অনুসরণ ও আনুগত্যের এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করাই তাদের দায়িত্ব বলে মনে করে। আর এভাবেই সে চিরন্তন মানবিক সম্মান-সফলতার সন্ধান পেল, দীর্ঘকাল ধরে মানব জাতি যা থেকে বঞ্চিত ছিল।

পৃথিবীতে তাওহীদের কলরবমুখর গুঞ্জরণ ও অন্য ধর্মের উপর এর প্রতিক্রিয়া

এটা মহানবী মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবেরই ফল ছিল– যা বিশ্বমানবতাকে আকীদায়ে তাওহীদের মত এক দুর্লভ উপহার দান করল– যা ছিল শতাব্দীকাল পর্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও বিস্মৃত এক বাস্তবতা, কিন্তু প্রিয় নবী (সা)-এর আবির্ভাবের পর সারা দুনিয়া জুড়ে গুঞ্জরিত হলো তাওহীদের আকীদা-বিশ্বাস। ফলে, পৃথিবীর প্রায় সকল পার্থিব ধর্ম-দর্শন ও ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনার উপর একত্ববাদের কম-বেশি প্রভাব পড়ল।

যেসব বড় বড় ধর্ম শিরক ও বহুত্ববাদের ওপর গড়ে উঠেছিল এবং যা তাদের শিরা-উপশিরায় মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত আকীদায়ে তাওহীদের প্রভাবে (অনুচ্চ কণ্ঠে ও ফিস ফিস করে হলেও) তাদেরকে এ কথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, আল্লাহ্ এক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। তারা নিজেদের শিরকি মতবাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা করতে শুরু করল যাতে নিজেদেরকে শিরক ও বিদআতের অপবাদ থেকে বাঁচাতে পারে এবং আকীদায়ে তাওহীদের সাথে কিছুটা সামঞ্জস্য প্রমাণিত হয়। কাজেই এখন আর ধর্মগুরু ও তাদের অনুসারীরা পর্যন্ত শিরকের অপবাদ শুনতে প্রস্তুত নয়। ফলে, সারা শিরকী কর্মকান্ডে তারা এক ধরনের হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে পড়ল। এ অবস্থায় তাওহীদের উপহার ছিল সবচেয়ে মূল্যবান উপহার– যা রাসূল (সা)-এর আবির্ভাবে বিশ্বমানবতা লাভ করে ধন্য হয়েছে। এ বাস্তবতার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক হযরত মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী (রহ) বলেন–

"ঐ জাতি-গোষ্ঠী, যারা আকীদায়ে তাওহীদ থেকে বেখবর ছিল, তারা মানুষের মর্যাদার ব্যাপারে ছিল পূর্ণ অজ্ঞ। তারা মানুষকে প্রাকৃতিক নিয়মেরই গোলাম মনে করত, কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর আনীত তাওহীদী শিক্ষার প্রভাবে মানুষের দিল থেকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবকিছুর ভয়-ভীতি দূর হয়ে গেল। আকাশের সূর্য থেকে যমীনের নদী-নালা ও পুকুর পর্যন্ত প্রভু হবার পরিবর্তে মানুষের গোলাম হয়ে তাদের সামনে আবির্ভূত হলো। রাজা-মহারাজাদের শান-শওকতের জৌলুস ভেঙ্গে গেল এবং তারা বাবেল (ব্যাবিলন) শহর, মিসর, ভারত ও ইরানের আল্লাহ্ ও মহাপ্রভু (اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى) হবার পরিবর্তে মানুষের খাদেম, সেবক ও পাহারাদার হিসেবে দৃষ্টিগোচর হলো।

"মানবীয় ভ্রাতৃত্ববোধ– যা দেবতাদের রাজত্ব উঁচু-নিচু, ক্ষমতাধর-দুর্বল ভদ্র ও ইতর প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিল, তাদের বিশ্বাস ছিল যে, তাদের কোন জাতকে পরমেশ্বরের মুখ দ্বারা, আবার কোন জাতকে পরমেশ্বরের হাত দ্বারা এবং কোন জাতকে পা দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, আর এ আকীদা-বিশ্বাসের কারণে মানবতা এমন সব জাত-পাতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না, আর এভাবে সাম্য ও সম্প্রীতি দুনিয়া থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল, যমীন জাতিগত বা গোষ্ঠীগত জুলুম-নির্যাতন, অহংকার ও গৌরবের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। তাওহীদ এসে ঐ সকল মান-মর্যাদা, উঁচু-নিচু, ভদ্র-ইতর ও জাত–পাতের বিভেদকে একাকার

করে দিল। সব মানুষ আল্লাহ্‌র বান্দা, তাঁর কাছে সব মানুষ সমান, সকলে পরস্পরে ভাই ভাই এবং সব ব্যপারে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। এ শিক্ষা দুনিয়াতে সামাজিকতা, রীতি-নীতি ও রাজনৈতিক অঙ্গনে যে সংস্কার সাধন করেছে, ইতিহাসের পাতা তার স্বাক্ষী।"

পরিশেষে তারাও এ মূলনীতির (তাওহীদের) অনুগ্রহ স্বীকার করেছে- যারা প্রকৃত অর্থে তাওহীদের সঠিক ধারণা হতে ছিল পূরোপুরি অজ্ঞ। আর এ কারণেই তারা আজও পর্যন্ত সাম্য ও সাম্য-প্রীতির মূল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় নি। চূড়ান্ত অবস্থা এই যে, তারা আল্লাহ্‌র ঘরে যাবার পরেও তাদের দিল-দেমাগ হতে বৈষম্যের ধারণা দূর হয় না এবং আল্লাহ্‌র সামনে মাথানত করেও ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য, বর্ণ ও জাতিগত পার্থক্যের কথা ভুলতে পারে না। অন্যদিকে, মুসলিম জাতি তেরশত বছর যাবত তাওহীদের আকীদা-বিশ্বাসের কারণে সাম্য ও সম্প্রীতির অমূল্য নিয়ামত পেয়ে ধন্য হয়ে আছে। তারা সকল প্রকার কৃত্রিম ভেদাভেদ থেকে মুক্ত। ইসলামের দৃষ্টিতে সবাই এক আল্লাহ্‌র বান্দা, সকলেই সমান, তাঁর সামনে সকলেরই মস্তক অবনত। ধনী বা দরিদ্র, রং ও রূপ, বংশ ও গোত্র পরিচয় তাদের মাঝে কোন বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে না। যদি কোন বিশেষত্ব থাকে, তাহলে শুধু তাকওয়া ও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাধ্যমে। ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ ـ

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মাঝে বেশি তাকওয়া অবলম্বনকারী।" [সূরা হুজুরাত : ১৩]

ভারতের ওপর একত্ববাদের প্রভাব

ভারতীয় চিন্তা-চেতনা এবং দর্শনের ওপর ইসলামের এ একত্ববাদী আকীদা-বিশ্বাসের যে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে, এ সম্পর্কে ভারতের বিশিষ্ট গবেষক কে, এম, পানিক্কর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন :

"এটা সর্বজনস্বীকৃত কথা যে, ইসলামি যুগে হিন্দু ধর্মের উপর ইসলামের গভীর প্রভাব পড়েছে। হিন্দুদের মধ্যে আল্লাহ্‌র ইবাদতের ধারণা ইসলামের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। তৎকালীন সময়ে যদিও বা হিন্দু ধর্মের ধর্ম ও দর্শনের নেতৃস্থানীয়রা নিজেদের উপাস্যদের বিভিন্ন নামে নামকরণ করেছিল, তথাপি তারা আল্লাহ্‌র ইবাদতের দাওয়াত দিত এবং তারা আল্লাহ্‌র এক হবার কথা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করত এবং আরো বলত, তিনিই একমাত্র ইবাদতের ও

উপাস্য হবার যোগ্য এবং তাঁর কাছে মুক্তি এবং সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা উচিত। ইসলামের এ প্রভাব ইসলামি যুগে ভারতের ধর্ম ও সংস্কার আন্দোলনের মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ভগতি ও কবীর দাসের[১] সংস্কার আন্দোলন।"[২]

প্রসিদ্ধ গবেষক ডঃ তারাচাঁদ ভারতবর্ষে ইসলামের প্রভাব সম্পর্কে লিখেছেন–

"ইসলামী খিলাফতের যুগ থেকে আরব মুসলমানেরা (দক্ষিণ ভারতের) উপকূলীয় অঞ্চলে পর্যটক হিসেবে আসত এবং নিজেদের স্বধর্মী আফগান, তুর্কী এবং মোঙ্গল বিজয়ীদের আগমনের অনেক আগেই তারা এখানে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য ও স্থানীয়দের সাথে সৌহার্দ্য গড়ে তুলেছিল। উপমহাদেশের এ অঞ্চলে নবম শতাব্দী হতে দ্বাদশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত ব্যাপক ধর্মীয় আন্দোলন শুরু হয়, যে আন্দোলনের সম্পর্ক শংকর রামনুজ (Sankara Ramanu JA) আনন্দতীর্থ (Anandatirtha) এবং বসু (Basaua) এর সাথে ছিল। এদের মাধ্যমে ঐতিহাসিক মতবাদ সৃষ্টি হয়েছিল– যার নজীর পরবর্তী হিন্দু মতবাদের মধ্যে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত দেখা যায় না।

এ আন্দোলন পুনর্জীবিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, দক্ষিণ ভারতের এ ধর্ম ও দর্শনগুলো পৃথক পৃথকভাবে সনাতন চিন্তা-চেতনার উৎস হতে গৃহীত ছিল কিন্তু সমষ্টিগতভাবে এবং বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এতে ইসলাম ধর্মের প্রভাব প্রকাশ পায়। আর এ কারণে ইসলাম থেকে প্রভাবিত হবার ধারণা অধিক যুক্তিসঙ্গত বলে মন হয়।"[৩]

মান্যবর ডঃ তারাচাঁদ তাঁর অন্য এক বইয়ে ভগতী মতবাদের উপর ইসলামের প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে বলেন :

"মিস্টিক্স (Mastics) নামে আরেকটি মতবাদ ছিল। এ মতবাদের প্রবর্তক সাধারণ ভাষা ব্যবহার করে তার বিপ্লবী চিন্তা-চেতনার প্রচার করে। এরা বেশির ভাগ নীচুজাতের মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখত। ফলে, তার আন্দোলন বঞ্চিত মানুষদেরকে উপরে উঠার ব্যাপারে আশাবাদী করে তুলেছিল। এদের অনেককে সরকারের রোষানলে পড়তে হয় এবং কেউ সামাজিক অসন্তুষ্টির মুখোমুখি হয়।

---

১. কবীর দাস একজন সূফীবাদী কবি। তিনি ভারতীয় সমাজের উপর সমালোচনা করতেন এবং সংস্কারের দাবি জানাতেন। তার ধর্মমত সম্পর্কে মতভেদ আছে।

২. A Survey of Indian History. P. 132

৩. Influence of Islam on Indian Culture. P.107

আর কিছু এমন ছিল যে, তাদের ব্যাপারে কোন মাথা ব্যথা ছিল না। কিন্তু বঞ্চিত গরীবেরা তাকে যথেষ্ট সমীহ করত এবং তার শিক্ষা-দীক্ষা অতি আগ্রহ সহকারে পালন করা হতো। এ সকল মনীষী মানবতার সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন। কারণ, তাদের শিক্ষার উল্লেখযোগ্য দিক হলো, প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব কর্মদ্বারা মানবতার শিখরে উন্নীত হতে পারে। এ মতবাদগুলো পনের শতাব্দীর দিকে শুরু হয়ে সতের শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। অতঃপর ধীরে ধীরে এগুলো বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। ঐ সকল মতবাদের অনুসারীরা হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল। তথাপি তাদের শিক্ষা ও আকীদা-বিশ্বাসের উপর ইসলামের প্রভাব সুস্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হয়।"[১]

শিখ ধর্মাবলম্বীদের অবস্থাও এটাই– যারা ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামরিক ও সভ্যতা-সংস্কৃতির অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। (হিন্দুধর্মের) মাঝে এ ধর্মাবলম্বীদের জন্ম ও উত্থানের মূল কারণ ইতিহাসের আলোকে ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের শুদ্ধিকরণরূপেই পরিদৃষ্ট হয়। এ ধর্মের প্রবর্তক বাবা গুরু নানক ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষাদ্বারা খুবই প্রভাবিত ছিলেন। তিনি ফারসি ভাষা ও ধর্মীয় জ্ঞান সাইয়েদ হাসানশাহ নামক একজন সূফী মুসলমানের কাছ থেকে অর্জন করেন। তিনি সূফী সাহেবকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। গুরু নানকের আরো অন্যান্য মুসলমান শিক্ষক ও গুরুরও উল্লেখ করা হয়েছে– যাদের সংখ্যা ছয়জন পর্যন্ত পাওয়া যায়। কথিত আছে, তিনি মক্কা-মদীনা শরীফ যিয়ারতও করেছিলেন এবং কিছুদিন বাগদাদে অবস্থান করেন। পাঞ্জাবের একজন বড় পীরে তরীকত জনাব শায়খ ফরীদের সাথেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

বাবা নানক তাঁর শিক্ষা ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাওহীদী বিশ্বাস, সাম্য ও সম্প্রীতি এবং মূর্তিপূজা ত্যাগের ব্যাপারে খুব তাকিদ করতেন।

খ্রিস্টান জগতের উপর তাওহীদের প্রভাব

প্রসিদ্ধ মিসরীয় গবেষক ডঃ আহমদ আমীন তাঁর 'দুহাল ইসলাম' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"খ্রিস্টান জাতিতে এমন কিছু মতানৈক্য দেখা যায় যাতে সুস্পষ্টভাবে ইসলামের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং অষ্টম শতাব্দী অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয়

---

১. Society And The State in the Muhgal Period by Dr Tarachand. (Delhi.1941) P.91

হিজরীতে সেপ্টমানিয়া (Septmania) নামক শহরে[১] এমন এক আন্দোলনের সূচনা হয় যারা পাদরীদের সামনে গুনাহের কথা স্বীকার করার পক্ষপাতী ছিল না। তাদের ধারণামতে, এ ব্যাপারে পাদরীদের এ ধরনের কোন ক্ষমতা দেয়া হয় নি; বরং মনুষের নিজের গুনাহের জন্য একমাত্র আল্লাহ্‌র সামনে মিনতি করা দরকার। আর যেহেতু ইসলাম ধর্মে পাদরী ও পুরোহিত নামের কোন দল বা ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই, এজন্য ইসলামে ঐ ধরনের কোন স্বীকারোক্তির ব্যবস্থাও নেই।

এ ধরনের আরো একটি আন্দোলন ধর্মীয় ছবি ও মূর্তির (Statues) বিরুদ্ধে ছিল– যাকে (Iconocla) বলা হয়। অষ্টম ও নবম শতাব্দী মুতাবিক হিজরী তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর দিকে (Iconocla) নামক একটি খ্রিস্টান দলের আবির্ভাব ঘটে, যারা ছবি ও মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি করার পক্ষপাতী ছিল না। রোমান সম্রাট তৃতীয় লিউ ৭২৬ খ্রিস্টাব্দে ফরমান জারি করে শাহী ঘোষণার মাধ্যমে ছবি ও মূর্তির সম্মান প্রদর্শনকে নিষিদ্ধকাজ বলে ঘোষণা দেন। অতঃপর ৭৩০ খ্রিস্টাব্দে এটাকে মূর্তিপূজার শামিল বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এভাবে পোপ (সচারী ২য় ও ৩য়) এবং জার্মানিউস কম্পটাইনের অনুরূপ, দারনীর শাসক মূর্তিপূজার পৃষ্ঠপোষক, আর কন্সটাইন ৫ম ও লিউ চতুর্থ এর বিরোধী ছিলেন। ফলে, তাদের মাঝে ছিল চরম দ্বন্দ্ব– যার বিবরণ দেয়ার সুযোগ এখানে নেই। এখানে শুধু এতটুকু প্রমাণ করা উদ্দেশ্য যে, ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে ছবিবিরোধী আন্দোলন ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত ছিল। সুতরাং ইতিহাসবিদদের ভাষ্য হলো :

তাওরীনে ধর্মযাজক ক্লোডিউস (যিনি এ পদে ৮২৮ মুতাবিক ৩১৩ হিজরীর দিকে সমাসীন হয়েছিলেন) ছবি ও ক্রুশচিহ্ন জ্বালিয়ে দিতেন এবং তার গির্জাগুলোতে এগুলোর উপাসনা করতে বারণ করতেন। এর কারণ হলো, তিনি স্পেনের ইসলামি পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে বড় হন ও শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন। ইসলামে ছবি ও মূর্তি একটি অপছন্দনীয় জিনিস, এটা প্রসিদ্ধ কথা। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ) তাঁদের প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীস গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন :

قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلَ. فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ يَا عَائِشَةُ : أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا

১. Macauliffe, the Sikh Religion ; শিবরাস সিং,Life of Gurunanak.

يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ ـ قَالَتْ فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَاهُ مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ ـ

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কোন এক সফর থেকে ফিরে আসলেন। আমি জানালাতে ছবিযুক্ত কাপড়দ্বারা পর্দা দিয়ে রেখেছিলাম। প্রিয় নবী এটাকে দেখে ফেঁড়ে ফেললেন। তখন তাঁর চেহারা মুবারকের রং বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং আমাকে (ধমকের সুরে) বললেন : আয়েশা! কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিকে বেশি শাস্তি দেয়া হবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সৃষ্টিশক্তির নকল করে।" তিনি বলেন, একথা শুনে আমরা সেটাকে কেটে একটি বা দু'টি বালিশ তৈরি করলাম।"

খ্রিস্টানদের একদল তো তাদের ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যা তাওহীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে করে থাকে এবং "তারা হযরত ঈসা মসীহ (আ)-এর ইলাহ হওয়াকে অস্বীকৃতি জানায়।"[১]

ইউরোপের ইতিহাস ও খ্রিস্টধর্মের গির্জাঘরের ইতিহাস পর্যালোচনাকারী পাঠকগণ ইউরোপীয় সংস্কারপন্থীদের উপর ইসলামি চিন্তা-চেতনার প্রভাব লক্ষ্য করে থাকবেন। ষোড়শ শতাব্দীতে সৃষ্ট লুথারের সংস্কার আন্দোলনের মাঝেও ইসলামি শিক্ষার ছাপ পাওয়া যায়। যেমন কোন গল্পের উপর দূরের আলোকছটা দেখা যায়, ঠিক তেমনি মধ্যযুগের সনাতনপন্থী ও গির্জার নারাজীর মধ্যেও এ কিরণ হালকা-হালকাভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিশিষ্ট খ্রিস্টান গবেষক J. Bass Mullinger এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।[২]

আরনেস্ট ডি বুনসেন (Ernest De Bunsen)-এর ধারণামতে, খ্রিস্টধর্মের ত্রিত্ববাদের এ অবস্থা এ ধর্মের উপর পল (Paul)-এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার কারণে এবং খ্রিস্টধর্ম তার চিন্তা-চেতনা ও মতাদর্শের অধীন হয়ে পড়ার কারণে হয়েছিল।[৩]

লুথার-এর নেতৃত্ব প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদ দুনিয়াবী ও দ্বীনি বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা-চেতনা, মানুষকে তার ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রদান এবং ধর্মীয় ব্যাপারে সহজীকরণ-এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মতবাদ তৎকালীন সময়ের অনুকরণপন্থী ও ধর্মীয়

---

১. দুহাল ইসলাম ১খন্ড. পৃঃ ২৬৪-২৬৫।

২. MULLINGER-এর প্রবন্ধ, মার্টিন লুথার

৩. দেখুন– ISLAM OR TRUE CHRISTIANITY. ERNEST DE BUNSEN

পুরোহিতদের বিরুদ্ধে চলে যায়। এ মতবাদের মূলমন্ত্র হলো "ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র সামনে জবাবদিহি করবে, গির্জার সামনে নয়।"

এ সকল চেষ্টা কেন বিফল হলো এবং কেন তা দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হয়নি

একটি ঐতিহাসিক ও গবেষণালব্ধ বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন, যা ধর্মীয় ইতিহাস এবং বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মানসিক অবস্থা দ্বারা প্রমাণিত। আর তা হলো সকল সংস্কার ও বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলো বিকৃতি ও বিচ্যুতির শিকারে পরিণত হয়ে যায়। কারণ, এ সকল ধর্মের প্রবর্তকগণ বিরাট জনগোষ্ঠী থেকে নিজেদেরকে পৃথক করতে সক্ষম হয়নি, যে ধর্মগুলোর মাঝে আন্দোলনগুলো আত্মপ্রকাশ করেছিল বরং ঐ ধর্মগুলো পূর্বের ধর্মীয় সমাজে মিলেমিশে বসবাস করত, যার মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসে তারা অস্বীকারকারী ছিল। ফলে, সকল সংস্কারবাদী আন্দোলন পূর্বের বিকৃত পুরাতন ধর্মে আত্মস্থ হয়ে গেল। যার শেষ পরিণাম হলো এই যে, সকল সংস্কার ও শুদ্ধি আন্দোলন এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিফল হয়ে গেল।

খ্রিস্টধর্মের সংস্কার ও শুদ্ধি আন্দোলনের পরিণতি এবং ভারতে আত্ম-প্রকাশকারী তাওহীদ ও সাম্য-সম্প্রীতির প্রতি আহবানকারী দলের পরিণতি আমাদের সামনে বিদ্যমান। অন্যদিকে, আম্বিয়া (আ) এবং ইসলাম ধর্মের অবস্থান এ ব্যাপারে অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্বচ্ছ । এ অবস্থার কথা হযরত ইব্‌রাহীম (আ) ও তাঁর ঈমানী চেতনার উত্তরসূরিদের কথার মাধ্যমে স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়, যে কথাগুলো তাঁরা তৎকালীন যুগের মুশরিকদেরকে বলেছিলেন এবং কুরআন আমাদেরকে তা অবহিত করেছে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرٰهِيْمَ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۖ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيْمَ لِأَبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ مَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنَا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيْرُ۔

"নিঃসন্দেহে (হযরত) ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তাঁরা তাদের স্বজাতি লোকদেরকে বলেছিল, তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের

থেকে আমরা মুক্ত, আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি হলো। যদি না তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়ন কর। তবে হযরত ইবরাহীম (আ) তার পিতার জন্য যে কথা বলেছিল যে, আমি অবশ্যই আপনার জন্য দু'আ করব, আর আপনার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিকট আমি কোন অধিকার রাখি না। হে আমাদের রব! আমরা আপনার উপরই ভরসা করেছি, আপনারই দিকে মুখ করেছি এবং প্রত্যাবর্তন তো আপনার কাছেই।" [সূরা মুমতাহিনা : ৪]

হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ও সুদৃঢ় অবস্থা কোন নির্দিষ্ট সময় ও সমাজের সাথে নির্ধারিত ছিল না, বরং তাঁর পরবর্তীদের জন্যও এ অসীয়ত করে গেছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ - إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ - وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ -

"(ঐ সময়ের কথা স্মরণ করুন) যখন (হযরত) ইবরাহীম (আ) তাঁর পিতা এবং স্বজাতিকে বলেছিলেন, তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, তবে তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে হিদায়াত করবেন। এ ঘোষণাকে তিনি স্থায়ী বাণীরূপে রেখে গেছেন তার পরবর্তীদের জন্য, যাতে ওরা ফিরে আসে।"

[সূরা যুখরুফ : ২৬,২৭,২৮]

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

"যাতে যে ধ্বংস হতে চায় সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্টরূপে প্রকাশের পর ধ্বংস হয় আর যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্টরূপে প্রকাশের পর জীবিত থাকে।" [সূরা আনফাল : ৪২]

মানবীয় ঐক্য ও সাম্যের ধারণা

মানবীয় ভ্রাতৃত্বের শক্তিশালী ও ঐতিহাসিক ঘোষণা

মানবতার নবী (সা)-এর দ্বিতীয় মহৎ অনুগ্রহ এবং দুনিয়ার বুকে চিরন্তন অবদান হলো মানবীয় ঐক্যের ধারণা। এর পূর্বে মানুষ বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী উঁচু-নীচু শ্রেণী এবং সংকীর্ণ বংশগত শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত ছিল। আর ঐ সকল শ্রেণীবিন্যাসের মাঝে পারস্পরিক বিভেদ এত বেশি ও এরূপ ছিল যে, যেমন মানুষ ও পশুর মাঝে বা স্বাধীন ও গোলামের মাঝে, অথবা যেমন বান্দা ও প্রভুর মাঝে ফারাক হয়ে থাকে। প্রিয় নবী (সা)-এর পূর্বে মানবীয় ঐক্য ও সাম্যের ধারণা মানুষের অলীক কল্পনা ও সুখস্বপ্নে পরিণত হয়েছিল। প্রিয় নবী (সা) শত শতাব্দীর সুদীর্ঘ নীরবতা ও চাদরে ঢাকা অন্ধকার ভেদ করে এ বিপ্লবী ঘোষণা দিলেন, যা মানুষের চিন্তা-চেতনায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী। তাঁর ঐতিহাসিক ঘোষণা ছিল :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ۔ وَإِنَّ أَبَاءَكُمْ وَاحِدٌ كُلُّكُمْ لآدم وآدم مِنْ تُرَابٍ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ إِتْقَاكُمْ۔ وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلَا بِالتَّقْوٰى۔

"হে মানুষ! তোমাদের রব এক, তোমাদের পিতা এক। তোমরা সকলে আদম থেকে, আর আদম মাটি থেকে। তাই তোমাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে মর্যাদার অধিকারী যে অধিক তাকওয়ার অধিকারী। কোন অনারবের উপর কোন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তাকওয়ার কারণ ছাড়া।"[১]

এর মাঝে একই সাথে দু'টি ঘোষণা ছিল, যা নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুটি স্তম্ভের ভূমিকা পালন করে। যাকে আরবী পরিভাষায় وحدة الرب ووحدة الاب (এক প্রভু ও এক পিতা)-এর উপর ভিত্তি করেই সবসময় ও সর্বত্রই শান্তি ও নিরাপত্তার প্রাসাদ নির্মিত হয়। যথা– প্রথমত, রবূবিয়তের একত্ব, দ্বিতীয়ত, মনুষ্যত্বের একত্ব। এদিক থেকে এক মানুষ অপর মানুষের সাথে দু'দিক থেকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়; প্রথমত হল রবের দিক থেকে এবং দ্বিতীয়ত হলো তাদের পূর্বপুরুষ ও আদিপিতা একজনই।

---

১. কানযুল উম্মাল

এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَّاتَّقُوْا اللهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا۔

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ হতে। অতঃপর তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের উভয় হতে অসংখ্য পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং ঐ আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পরকে চাও এবং আত্মীয়তা সম্পর্কে সতর্ক থাক, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক।" [সূরা নিসা : ১]

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ۔

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে একটি পুরুষ ও একটি নারী হতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচয় লাভ করতে পার। আর অবশ্যই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মর্যাদার অধিকারী ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়ার অধিকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"

[সূরা হুজরাত : ১৩]

এক হাদীসে প্রিয় নবী (সা) ইরশাদ করেন :

اِنَّ اللهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ عَصَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْاٰبَاءِ ۔ اِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ اَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ ۔ اَلنَّاسُ بَنُوْ آدم ۔ وَآدم خَلَقَ مِنْ تُرَابٍ ۔ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ اِلَّا بِالتَّقْوٰى۔

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহিলী অহমিকা ও পূর্বপুরুষদের নিয়ে অহংকার করার প্রথা শেষ করে দিয়েছেন। এখন হয়তো সে মুমিন মুত্তাকি হবে অথবা হতভাগ্য ফাজের হবে। সকল মানুষই আদম সন্তান। আর আদম হলেন মাটির তৈরি। সুতরাং, কোন অনারবের উপর আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, যদি সে তাকওয়া অর্জন না করে।"

এ কারণেই ইসলাম ধর্ম সকল জাতি-গোষ্ঠী, বংশ-খান্দান, সকল দেশ ও মহাদেশের এজমালী সম্পদ ও সামগ্রিক অধিকারসম্পন্ন। এতে ইয়াহূদীদের

লাবী বংশ অথবা হিন্দুদের ব্রাহ্মণদের মত কারো কোন বিশেষ অধিকার প্রতিষ্ঠিত নেই অথবা এখানে এক বংশ অন্য বংশের উপর অথবা এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার নয় অথবা শ্রেষ্ঠত্বের ও বিশেষত্বের মানদণ্ড হিসেবে বংশ ও রক্ত বিবেচিত হয় না; শ্রেষ্ঠত্বের মৌলিক মানদণ্ড হলো মানুষের নিজস্ব আগ্রহ, পিপাসা ও সাধনা, যোগ্যতা, সংগ্রাম ও কঠিন অধ্যবসায়। হযরত ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ) নিজস্ব সনদে প্রিয় নবী (সা) হতে বর্ণনা করেন :

لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسٍ.

"জ্ঞান যদি ধ্রুবতারার কাছেও থাকে, তাহলে অবশ্যই তা ইরানের কিছু সন্তান অর্জন করতে সক্ষম হবে।"

ফলে আরবগণ সবসময় ধর্মীয় জ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী ও বিশেষত্বের অধিকারী অনারব আলিম-উলামাকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেছেন এবং তাদের ইলম ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন; তাদের আমানতদারী ও ইলমী নেতৃত্বকে মেনে নিয়েছেন এবং তাদেরকে এমন সব খেতাবে ভূষিত করেছেন– যা সাধারণত আরব আলিমদেরকে প্রদান করা হয়নি। তারা বুখারী শরীফের লেখক ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরা ইবন বারদিসবা) আল-জু'ফী আল-বুখারী (রহ)-কে 'আমীরুল মুমিনীনা ফিল হাদীস' খেতাবে ভূষিত করেছেন এবং তার গ্রন্থকে পবিত্র কুরআনের পরে 'অধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। এমনিভাবে আরবগণ ইমাম আবুল মা'আলী আব্দুল মালিক আল-জুয়াইনী নিশাপুরীকে (মৃঃ ৪৬৮ হিঃ)-কে 'ইমামুল হারামাইন' খেতাব প্রদান করেছেন এবং ইমাম আবূ হামেদ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-গাযযালী তূসীকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এ ছাড়া হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষদিকে মাওয়ালী ও অনারব অধিবাসীগণ সকল ইসলামি রাজধানীতে মুসলমানদের নেতা ও আস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন। তাদের উপরই নির্ভর করত শিক্ষা, ফতোয়া, ফিকহ ও হাদীসসহ সকল বিষয়। এটি একটি সর্বজনবিদিত বাস্তবতা। তাবাকাত ও তারাজিম, (বিষয়ভিত্তিক জীবনী গ্রন্থ) ও ইসলামের সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এটা ঐ সময় হয়েছিল যখন ছিল ইসলামের স্বর্ণযুগ এবং আরবদের হাতেই ছিল নেতৃত্ব ও ক্ষমতা।

একজন ক্ষণজন্মা আরব মনীষী আল্লামা আব্দুর রহমান ইবন খালদূন আল-মাগরিবী (মৃঃ ৮০৮ হিঃ) এ সম্পর্কে লিখেছেন :

"এটি একটি বিস্ময়কর ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, মুসলিম উম্মাহর মাঝে শরী'আত বিষয়ক জ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক জ্ঞানের অধিকাংশের ধারক বাহক হলেন অনারব অধিবাসীগণ। আরবগণ এ সকল বিষয়ে খুবই কম নযর দিয়েছিল। অথচ এ জাতি ছিল আরবী ভাষা এবং শরী'আতের কর্ণধার হলেন আরব। অথচ নাহুশাস্ত্রের ইমাম হলেন সিবাওয়ায়হ ও তাঁর পরে আবূ আলী ফারিসী, তারপরে আল-যুজ্জাজ। আর তাঁরা সবাই অনারব বংশোদ্ভূত। এভাবে হাদীস, উসূলে ফিকহ ও ইলমে কালাম বিষয়ে বিজ্ঞ পণ্ডিত ও অধিকাংশ তাফসীরবিশারদ ছিলেন অনারব।[১]

প্রিয় নবী (সা)-এর উল্লিখিত হাদীসটি (যা উপরে অতিক্রান্ত হয়েছে) অত্যন্ত চিরন্তন সত্য ভাষণ ছিল যা তিনি বিদায় হজ্জের সময় পবিত্র যবানে প্রদান করেন। প্রিয় নবী (সা) যে সময় এ ঐতিহাসিক ঘোষণাটি প্রদান করেন, দুনিয়া তখন এ বজ্রসম ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘোষণাকে মেনে নেওয়ার মত সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না।

আমাদের স্বভাবই হলো যে, কোনকিছুকে ধীরে ধীরে এবং কোন মাধ্যমে গ্রহণ করে থাকি। যেমন বিদ্যুৎকে আমরা বিদ্যুৎ নিরোধক অবস্থায় বা তারের মধ্যে লুকায়িত অবস্থায় ধরতে পারি কিন্তু যদি তা সরাসরি ধরতে যাই, তাহলে কঠিন কম্পনের (Shock) মুখোমুখি হই আর তা আমাদের জন্য মৃত্যুর যমদূত হয়ে উপস্থিত হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, কোন বিষয় অনুধাবন ও উপলব্ধি, চিন্তা-দর্শন যে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে, তা বিশ্বমানবতা ইসলামি-দাওয়াত, ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা এবং ধর্ম প্রচারক সংস্কারকগণের সাধনার ফলে সম্ভব হয়েছে। ঐ মহান বিপ্লবী ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী সত্য ঘোষণা আজ বর্তমান বিশ্বের নিত্যদিনের চিরন্তন বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। আজ দুনিয়ার সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন তাকে সানন্দে গ্রহণ করেছে। বর্তমানে তার স্বাভাবিক পরিণতি হলো, 'মানবাধিকারের ঘোষণা' বর্তমানে জাতিসংঘ যার পতাকাবাহী। এমনিভাবে ঐ সকল ঘোষণা তারই ফসল– যা সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং ও মানবাধিকার ও সাম্যের পতাকাবাহী সংগঠনসমূহ বারবার ব্যক্ত করছে আর এতে কেউ আশ্চর্যবোধ করছে না।

---

১. মুকাদ্দমা ইবনে খালদুন (মিসরে মুদ্রিত), পৃঃ ৪০১

ইসলাম-পূর্ব মানব সমাজ এবং এতে ব্যক্তি ও গোত্রের মাহাত্ম্য

মানব ইতিহাসে এমন একযুগও অতিবাহিত হয়েছে, যখন তাদের দিল ও দেমাগ কিছু কিছু জাতি-গোষ্ঠীর ব্যাপারে মহৎ ও অতিমানব হওয়ার ধ্যান-ধারণায় আচ্ছন্ন ও প্রভাবিত ছিল। ফলে, কিছু কিছু জাতি-গোষ্ঠী তাদের বংশ-লতিকা চন্দ্র, সূর্য ও স্রষ্টার সাথে মিলিয়ে ফেলেছিল। পবিত্র কুরআনে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে :

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ۔

"ইয়াহূদী-খ্রিস্টানেরা বলে, আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র এবং তাঁর প্রিয়পাত্র।"

[সূরা মায়িদা : ১৮]

মিসরের ফিরাউনদের ধারণা ছিল, তারা সূর্যদেবতা 'রে' (RE)-এর বহিঃপ্রকাশ ও তার মূর্ত প্রতীক। ভারতবর্ষে দু'টি বংশকে সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশ বলা হত। ইরানের বাদশাহ কিসরাগণের ধারণা ছিল, তাদের ধমণীতে ঈশ্বরের রক্ত প্রবহমান, এ কারণে তার প্রজারা তাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখত। পারস্য সম্রাট পারভেজ (৫৯০–৬২৮ খ্রিঃ)-এর প্রশংসায় বলা হত যে, তিনি প্রভুদের মাঝে অবিনশ্বর মানব এবং মানুষের মাঝে অদ্বিতীয় প্রভু। তার বাণী সমুন্নত, সম্মান সর্বোচ্চ, তিনি সূর্যের সাথে উদিত হন এবং স্বীয় দ্যুতিদ্বারা অন্ধকার রাতকে আলোকিত করেন।[১]

রোম সম্রাট কায়সারকেও ঈশ্বর মনে করা হত। তার উপাধি ছিল (August) মহান ও মহাত্মন।[২] চীনারা তাদের সম্রাটকে আকাশপুত্র মনে করত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, আকাশ হলো নর আর যমীন হলো নারী। এদের উভয়ের মিলনের মাধ্যমে এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। সম্রাট প্রথম খত্তা সেই যুগলের প্রথম সন্তান।[৩]

আরবের অধিবাসীরা নিজেদের ছাড়া অন্যদেরকে আজমী (বাকহীন) মনে করত। কুরায়শ গোত্র সকল আরব গোত্রের মাঝে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করত। ফলে, তারা হজ্জের মৌসুমেও নিজেদের এ স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখত। অন্য লোকদের সাথে মেলামেশা করত না, আরাফাতের দিন অন্য হাজীদের সাথে আরাফার মাঠে সমবেত হওয়ার পরিবর্তে তারা কাবা শরীফেই অবস্থান করত। অতঃপর

---

১. সাসানী যুগে ইরান, আর্থার ক্রিস্টেনশন প্রণীত পৃঃ ৬৪

২. The Roman World By Victor Chopart. P. 418.

৩. চীনের ইতিহাস, জেমস কারকর্ণ প্রণীত

তারা মুযদালিফাতে যেত। আর বলত, "আমরা আল্লাহ্ তা'আলার শহরের বাসিন্দা, তাঁর ঘরের প্রতিবেশী।" আর কখনো বলতো, "আমরা বিশেষ লোক।"[১]

ভারতবর্ষ সমসাময়িক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শ্রেণী-বৈষম্য ও মানুষে-মানুষে ভেদাভেদের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিল। তাদের সমাজব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর, তাতে কোন নমনীয়তা ও সহনশীলতা ছিল না, এ ব্যবস্থার পক্ষে ধর্মের সমর্থন ও সহযোগিতাও ছিল। এ ব্যবস্থা বহিরাগত জাতি, ধর্ম ও পবিত্রতার ইজারাদার ব্রাহ্মণদের স্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। তাতে উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে পেশা, বংশ ও খান্দান নির্ধারণ করা হত। আর তা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিধানের মর্যাদা রাখত। যেভাবে এটাকে ভারতের ধর্মীয় নেতারা প্রণয়ন করেছিল, তাতে তা সমাজের সাধারণ নিয়ম ও জীবনপদ্ধতিতে পরিণত হয়েছিল। তাদের ঐ বিধান ভারতের অধিবাসীদেরকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিল–

১. ব্রাহ্মণ ও ধর্মীয় শ্রেণী;

২. সামরিক ও সৈন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয়;

৩. ব্যবসায়ী ও কৃষক অর্থাৎ বৈশ্য; এবং

৪. সেবক অর্থাৎ শূদ্র।

এরাই হলো সর্বনিম্ন শ্রেণী। স্রষ্টা এদেরকে নিজের পা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উপর উল্লিখিত তিন শ্রেণীর সেবা করা অপরিহার্য করে দিয়েছেন।

এ বিধান ব্রাহ্মণদেরকে এমন প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে যাতে অন্য কোন শ্রেণী শরীক নেই। ব্রাহ্মণকে সর্বাবস্থায় মুক্তিপ্রাপ্ত স্বর্গীয় মনে করা হত যদিও তারা তাদের অপরাধ ও কুকর্মের দ্বারা ত্রিভুবনকে ধ্বংস করে ফেলে। তাদের উপর কোন কর আরোপ করা হত না, তাদেরকে কোন অবস্থাতেই মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হত না। অন্যদিকে, শূদ্রদের মাল জমা করার, ব্রাহ্মণদের সাথে উঠাবসা করার, তাদেরকে স্পর্শ করার এবং পবিত্র গ্রন্থসমূহের শিক্ষা অর্জন করার অধিকার ছিল না।[২]

পেশাজীবী তাঁতী, জেলে, কসাই, ধোপা, মেথর ইত্যাদি শ্রেণীর লোকদের মনুশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী শহরের ভিতরে বসবাস করার অধিকার ছিল না। তাই তারা শহরের বাইরে বসবাস করত। তারা তাদের কাজকর্ম করার জন্য সূর্য-

---

১. বুখারী শরীফ, হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত

২. ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থা জানার জন্য মনুশাস্ত্রের ১, ২, ৮, ৯, ১০, ১১ তম অধ্যায় দেখুন।

উদয়ের পর শহরে আসত এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই শহরের বাইরে চলে যেতো। এ নিয়মের কারণে তাদের শহরের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ও আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করার কোন সুযোগ ছিল না। ফলে, তারা জরাজীর্ণ গ্রাম্য জীবন যাপন করতে বাধ্য ছিল।[১]

ইসলামের সাম্যের ধারণা ও বিশ্বব্যাপি এর প্রভাব

মুসলমানগণ ভারতবর্ষে আসার সময় সাথে করে যে বিস্ময়কর বস্তু নিয়ে এসেছিলেন, তা ছিল মানবসাম্যের ধারণা। এ বিষয়ে ভারতীয়দের কোন জ্ঞান-বা ধারণা ছিল না। মুসলিম সমাজে না ছিল শ্রেণীবৈষম্য, আর না ছিল শুদ্র সমাজ ব্যবস্থা। এখানে কেউ জন্মগত অছ্যুৎ অথবা কারো জন্য লেখাপড়া নিষিদ্ধ ছিল না। আবার বংশগত পেশার স্বাতন্ত্র্য ও স্থায়ী প্রথা ছিল না; বরং তারা মিলেমিশে বসবাস করতেন এবং একই সাথে এক দস্তরখানে খাবার গ্রহণ করতেন। সকলেই একত্রে লেখাপড়া শিখতেন, ইচ্ছামত পেশা গ্রহণ করতেন। এটি ভারতীয় চিন্তা-চেতনা ও সমাজ ব্যবস্থার জন্য ছিল এক মারাত্মক চ্যালেঞ্জ। তা সত্ত্বেও তা ভারতকে বড়ই উপকার করেছে এবং শ্রেণীবৈষম্যের অভিশাপকে কিছুটা হলেও লাঘব করেছে। আর তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বড় শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে। যা সমাজ সংস্কারের পতাকাবাহীদেরকে তৎপর করেছে এবং ছ্যুত-অচ্ছ্যুতের দ্বন্দ্ব নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছে।

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এ ঐতিহাসিক বাস্তবতার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন এভাবে :

"ভারতের ইতিহাসে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিজয়ীগণ ও ইসলামের আগমনের বড় গুরুত্ব রয়েছে। তারা ভারতীয় সমাজের ফ্যাসাদকে প্রকাশ করেছে এবং তাদের শ্রেণী বৈষম্য ও ছুত-অচ্ছুত এবং ভারতের বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন থাকার বিষয়টি স্পষ্ট করেছে, ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য-সৌহার্দ্য এবং যার উপর মুসলমানদের ঈমান ও আমল ছিল, হিন্দুদের মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তা - চেতনাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। যা ভারতীয় সমাজব্যবস্থা তাদের জন্য সাম্য-সৌহার্দ্য এবং মানবাধিকার থেকে উপকৃত হবার দরজা বন্ধ করে রেখেছিল।"[২]

---

১. মনুস্মৃতি এবং Manu And Yajnvalky A. By Jayaswal. P.

২. Discovery of India, Calcautta. 1946. P. 223

হিন্দুধর্মের উপর ইসলামের প্রভাবের কারণে দক্ষিণ ভারতে 'ভগতি' আন্দোলনের জন্ম হয় এবং তা অতি দ্রুত সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এ আন্দোলন সম্পর্কে ড. তারা চাঁদ লেখেন :

"তাদের সাথে অনেক আল্লাহ্ওয়ালা লোক ছিলেন– যারা জনসাধারণকে সম্বোধন করে তাদেরকে মৌখিক উপদেশ প্রদান করতেন এবং জনগণের সাধারণ ভাষা ব্যবহার করতেন। তাদের অনেকের কবিসূলভ যোগ্যতাও ছিল। তাদের কবিতা সাধারণ মানুষের দিলে গেঁথে যেত। তারা পন্ডিতসুলভ পরিভাষা বর্জন করেন। তারা আল্লাহ্ তায়ালা ও মানুষের ভালবাসার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন, মূর্তিপূজা, শ্রেণী বৈষম্য, লৌকিকতা, বিভেদ ও জৌলুসপূজার নিন্দা করতেন। তাদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সাধুতা ও নির্মোহ জীবন সাধারণ মানুষের উপর গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে।"

"তারাই বর্তমান ভারতীয় ভাষার ভিত্তি স্থাপন করে। তাদের উদ্যম মানব জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং জনসাধারণকে উচ্চ ও নিঃস্বার্থ খিদমতের জন্য প্রস্তুত করে। পনের, ষোল ও সতের শতাব্দীতে তারা দেশের সর্বত্রই এক বিস্ময়কর আশা-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল– যা তাদের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের উচ্ছ্বাসিত অবস্থা ছাড়া উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ঐ শতাব্দীগুলো তাদের হৃদয়গ্রাহী বাণীতে মুখরিত ছিল। তাতে একই সাথে সতর্কীকরণ ও উৎসাহদান অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সকল লোক সত্যিকার অর্থে উদার ও প্রশস্ত দিলের অধিকারী ছিলেন। তাদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। তাদের অনেকেই নীচু শ্রেণীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তারা জন্মের ভিত্তিতে সম্ভ্রান্ত হওয়ার ভ্রান্ত ধারণাকে নির্মূল করেন।"[১]

বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ প্রফেসর গিব (Gibb) বিশ্ব সভ্যতায় ইসলামের প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ-করতে গিয়ে লিখেছেন :

"ইসলামকে মানবতার জন্য আরো একটি খিদমত আঞ্জাম দিতে হবে। মানুষের স্তর, অবস্থান ও পেশার ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাম্য-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অন্য কোন সমাজব্যবস্থা তার মত সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। আফ্রিকা, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়ার বিশাল ও জাপানের সীমাবদ্ধ মুসলিম সমাজের দ্বারা এ বিষয় স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম কিভাবে বিভিন্ন

১. Tara Chand. Socitety and Statein the Mughal Period. Publication Division, Ministry of Information and Broadcusting 1961.p. P. 88. 89

জাতিগোষ্ঠী ও রীতি-নীতি এবং অমীমাংসিত বিরোধসমূহকে সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং যদি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিশাল জনগোষ্ঠীর মাঝে বিরোধের পরিবর্তে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা সৃষ্টি করতে হয়, তাহলে তার জন্য ইসলামের খিদমত গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।"[১]

প্রখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক ঐতিহাসিক টয়েনবী (A. J. Toynbee) ইসলামি সাম্যের স্বীকৃতি প্রদান করে লিখেছেন :

"মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে বংশগত ভেদাভেদের মূলোৎপাটন ইসলামের মহৎ অবদানসমূহের একটি অন্যতম অবদান। আর বর্তমান যুগে ইসলামের এ মহানুভবতা সময়ের সর্ববৃহৎ প্রয়োজন। ..... যদিও অন্য কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে ইংরেজী ভাষাভাষীদের সফলতাসমূহ মানবতার জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এটা অনস্বীকারযোগ্য বাস্তবতা যে, জাতিগত আবেগসমূহের বিপদের ক্ষেত্রে তারা দুর্ভাগাই রয়ে গেছে।"[২]

ভারতের প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট নারী সরোজনী নাইডু ইসলাম প্রদত্ত ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য-সম্প্রীতির বিষয়টি উদার মনে এভাবে স্বীকার করেছেন :

"এটি সর্বপ্রথম ধর্ম যা গণতন্ত্রের প্রচার-প্রসার করেছে এবং তা বাস্তবায়ন করেছে। মসজিদগুলোতে আযানের সাথে সাথে ইবাদতকারীগণ একত্রিত হয় এবং দিনে পাঁচবার তারা আল্লাহু আকবার ঘোষণায় একসাথে মাথা অবনত করে এবং ইসলামি গণতন্ত্রের বাস্তবায়ন করে। আমি বার বার অনুভব করেছি যে, ইসলাম সমষ্টিগত কর্মের দ্বারা এক মানুষকে অপর মানুষের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে দেয়। যদি আপনি লন্ডনে কোন মিসরী, আলজিরিয়ান, ভারতীয় এবং তুর্কি মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে দেখেন, তাহলে এতে কোন গুরুত্ব থাকে না যে, একজনের দেশ মিসর আর অপরজনের জন্মভূমি ভারত।"[৩]

প্রসিদ্ধ আফ্রিকান নেতা মালকম এক্স (Malclm-x) তাঁর আত্মজীবনীতে মুসলিম সমাজের এবং ইসলামি সভ্যতা কর্তৃক প্রদত্ত ঐক্য ও সাম্যের বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেন :

"আমি ঐ সকল ইসলামি দেশে বিগত এগার দিন যাবত একই প্লেটে খাবার খেয়েছি, একই গ্লাসে পানি পান করেছি এবং তাদের সাথে একই গালিচায়

---

১. H. A. R. Gibb Whtther Islam.

২. A. J. Toynbee; Civilization on Trial Newyork-1848. P. 205.

৩. Sarojini Naidu: Speeches And Writings of Sarojini Naidu ,madras. 1918. P. 167.

ঘুমিয়েছি। ..... আমি তাদের মাঝে ঐ রকম আন্তরিকতা পেয়েছি– যার অনুভূতি আমার হয়েছিল নাইজিরিয়া, সুদান ও ঘানার কালো আফ্রিকান মুসলমানদের মাঝে।

"আমরা সকলে ভাই ভাই ছিলাম, কেননা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস আমাদের দিল-দেমাগ, চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণ থেকে গৌরবর্ণের বিশেষত্বকে মিটিয়ে দিয়েছে। আমার বুঝে এসে গেছে যে, যদি আমেরিকার লোকজন তাওহীদ ও একত্ববাদে বিশ্বাসী হত, তাহলে হয়ত তারাও মানব ঐক্যের বিষয়টি গ্রহণ করত; রঙ বা বর্ণের ভিত্তিতে অন্য লোকদের তুলনা, বিরোধিতা বা শত্রুতা করা ত্যাগ করত। আমি এ বিষয়টি হৃদয়ে গেঁথে নিয়েছি যে, আমি আমেরিকার জনগণকে বলব, এখানে সকল বর্ণের মানুষের মাঝে সত্যিকার অর্থে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রয়েছে, কোন মানুষই নিজেকে ভিন্ন ও পৃথক মনে করে না– সেখানে কারো মাঝে শ্রেষ্ঠত্ববোধ বা হীনম্মন্যতা বোধ নেই।"[১]

১. The Autobiography of Malcolm x (essx) 1965 p. 419-420.

মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা

তৃতীয় মহৎ অবদান

মানব জাতির উপর রাসূলুল্লাহ (সা) ও ইসলামের তৃতীয় বড় অবদান হলো মানবজাতির মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ও তার সুউচ্চ মর্যাদার ঘোষণা প্রদান। প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তের পূর্বে মানুষ অপমান ও অপদস্থের গভীরে নিমজ্জিত ছিল এবং ভূপৃষ্ঠে তার থেকে অধিক নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ কোন প্রাণী ছিল না। কিছু পবিত্র প্রাণী ও বৃক্ষ ছিল এবং যেগুলোর ব্যাপারে কাল্পনিক কাহিনী ও ভক্তিমূলক বিশ্বাস জুড়েছিল। ঐ সকল বস্তু পূজারীদের নিকট অধিক সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন ছিল এবং মানুষের পরিবর্তে সেগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণের অধিক যোগ্য মনে করা হত। যদি এ কারণে কোন নিরাপরাধ ব্যক্তির রক্তের প্রয়োজন হলে তাতে পিছপা হত না। ঐ সকল বৃক্ষ ও পাথরের সামনে মানুষের রক্ত-মাংস অকৃত্রিম ভালবাসা ও ঠান্ডা দিলে পেশ করা হত। আমরা এখনো তার ভয়াবহ চিত্র এ বিংশ শতাব্দীতে ভারতের মত কতিপয় উন্নত দেশেও দেখতে পাই।

সাইয়েদিনা মুহাম্মদ (সা) মানুষকে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে বহাল করলেন এবং তার হারানো সম্মান ও অবস্থান পুনরুদ্ধার করলেন। ফলে, সে মানুষই হলো এ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বস্তু ও মহামূল্যবান সম্পদ, পৃথিবীর বুকে তা থেকে অধিক মর্যাদার, মহব্বতের ও হেফাযতের যোগ্য আর কোন বস্তু নেই। প্রিয় নবী (সা) মানুষের মর্যাদা অতি সুউচ্চ শিখরে পৌঁছে দিলেন এবং ঘোষণা দিলেন যে মানুষই হলো এ ধরণীর বুকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি ও খলীফা। এ মানুষের জন্যই এ দুনিয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে– আল্লাহ্‌র জন্য। এ মর্মে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন :

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا۔

"তিনিই (আল্লাহ্) তোমাদের জন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা বাকারা : ২৯]

পবিত্র কুরআন তাকে আশরাফুল মাখলুকাত সৃষ্টির সেরা ও বিশ্বজগতের মধ্যমণি ঘোষণা দান করেছে :

وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ وَ حَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا۔

"আমি তো বনী আদমকে মর্যাদা দান করেছি এবং স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে উত্তম রিযিকদান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"

[সূরা বনী ইসরাঈল : ৭০]

এক্ষেত্রে প্রিয় নবী (সা)-এর পবিত্র বাণী মানুষের ইযযত ও শ্রেষ্ঠত্বের নজীরবিহীন ঘোষণা। তিনি ইরশাদ করেন–

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ۔ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ۔

"সৃষ্টি জীব আল্লাহ্‌র পরিবার। অতএব ঐ ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট অতি প্রিয় যে তার পরিবারের সাথে সদাচরণ করে।" [বায়হাকী]

মানুষের মর্যাদা প্রদান ও তাদের খিদমতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নের হাদীসটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও অর্থবহ– যা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) প্রিয় নবী (সা) হতে বর্ণনা করেন।

"আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করবেন, হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ ছিলাম কিন্তু তুমি আমার সেবা করতে আসনি। মানুষ বলবে, হে রব! আপনি রাব্বুল আলামীন, আমি কিভাবে আপনার সেবা করতাম? এতে আল্লাহ্ তাআলা বলবেন– তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, তারপরেও তুমি তার সেবা করনি? তুমি কি জানতে না, যদি তুমি তার সেবা করতে, তাহলে তুমি আমাকে তার কাছে পেতে।

"হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে আহার করাওনি। মানুষ বলবে– হে আল্লাহ্! আপনি তো বিশ্বজগতের পালনকর্তা, আপনাকে কিভাবে আহার করাতাম? তখন আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করবেন– বান্দা! তোমার কি জানা ছিল না যে, আমার অমুক বান্দা ক্ষুধার্ত ছিল, সে তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল? যদি তাকে খাবার দিতে তাহলে তার কাছে আমাকে পেতে।

"হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি দাওনি। মানুষ বলবে– হে আল্লাহ্! আপনি তো রাব্বুল আলামীন। আপনাকে কিভাবে পানি পান করাতাম? আল্লাহ্ বলবেন– আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে পানি দাওনি। যদি তুমি তাকে পানি দিতে, তাহলে তার কাছে আমাকে পেতে।" [মুসলিম]

মানুষের সুমহান মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের এ থেকে অধিক স্পষ্ট কোন ঘোষণা কল্পনা করা যায়, যা তাওহীদবাদী ধর্ম পেশ করেছে? অতীত ও বর্তমান দুনিয়ার কোন ধর্ম-দর্শনের পতাকাতলে মানুষ কি কখনো এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল?

রাসুলুল্লাহ (সা) মানব জাতির উপর রহম করাকে আল্লাহ্‌র রহমতের জন্য অনিবার্য শর্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنَ۔ اِرْحَمُوا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ۔

"রহমকারীদের উপর 'রহমান'-ও রহম করেন। সুতরাং তোমরা যমীন-বাসীদের প্রতি দয়া কর, আসমানবাসী তোমাদের উপর দয়া করবেন।"

[সুনানে আবূ দাউদ]

কোন কবি বলেন–

کرو مہربانی تم اہل زمیں پر * خدا مہربان ہوگا عرش بریں پر

"তোমরা জগতবাসীর প্রতি দয়া কর, তাহলে আল্লাহ্ 'আরশ হতে তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"

মানবতার ঐক্য ও মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এ জন্য চেষ্টা-সাধনা করার পূর্বে দুনিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

প্রিয় নবী (সা)-এর নবূয়তলাভের পূর্বে এক-একটি মানুষের ইচ্ছার উপর হাজার হাজার মানুষের জীবন নির্ভর করত। কখনো কোন রাজা রাজত্ব গ্রহণ করত আর অমনি দেশ-জাতি, ক্ষেত-খামার ও জনবসতিকে পদদলিত করে চলে যেত। রাজত্বের নেশা ও রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য মুহূর্তে জলস্থলকে তছনছ করে ফেলত।

মহামতি আলেকজান্ডার (Alexander the Great = ৩৫৬ – ৩২৪ খ্রিঃ পূঃ) জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় উদিত হন এবং ইরান, সিরিয়া, উপকূলীয় দেশসমূহ, মিসর এবং তুর্কিস্তানের বিরাট অংশ ওলট-পালট করতে করতে উত্তর ভারত পর্যন্ত পৌঁছেন। জয় ও ক্ষমতার নেশায় তিনি এ দীর্ঘ সফরে শত শত বছরের পুরাতন ও উন্নত সভ্যতা ও শহর-নগরকে ধূলোয় মিশিয়ে দেন।

জুলিয়াস সীজার (Julius Caesar = মৃ.৪৪ খ্রিঃ পূঃ) এবং অন্যান্য বিজয়ী ও সেনাপ্রধান, যেমন– কারতাজা-(Cartnage), হ্যানিবাল (Hannibal = ২৪৭ -

১৮৩ খ্রিঃ পূঃ) এবং অন্যান্য সেনা কমান্ডার ও সেনাবাহিনীর সদস্যগণ মানব বসতির মাঝে এভাবে রক্তের হোলিখেলা করে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ আদম সন্তানকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছিল, যেমন অনুশীলনকারী নিষ্ঠুর শিকারী নির্বিচারে বন্য প্রাণী শিকার করে থাকে।

মানবজীবন ও মানবীয় শরাফতের সাথে ঐ ধরনের ধ্বংসলীলা হযরত ঈসা মসীহ (আ) আবির্ভাবের পরেও অব্যাহত ছিল। তাঁর পরে মানবতার প্রতি জুলুমকারী ও পাষাণ-হৃদয়ের অধিকারীদের মধ্যে নীরু (Nero-g.৬৪ খ্রিঃ)-এর মত ব্যক্তিরা স্বদেশীদের উপর জুলুম-অত্যাচার করেছে এবং এমনকি সে তার মা ও স্ত্রীকেও ক্ষমা করেনি। এ ব্যক্তিই রোমের মহা অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী। যখন রোম অগ্নিশিখায় জ্বলছিল, তখন তিনি শান্তিতে বাঁশি বাজাচ্ছিলেন।[১]

ইউরোপের হিংস্র গোত্রগুলো, যেমন পূর্ব ও পশ্চিমে গ্যাথিক, ভিন্ডাল ও অন্যান্য জাতি মুহাম্মদ (সা)-এর নবূয়ত লাভের এক শতাব্দী পূর্বে পঞ্চম শতাব্দীতেও ধ্বংসলীলায় মত্ত ছিল। তারা দুনিয়ার বড় বড় সমৃদ্ধ রাজধানী-গুলোতে লুটতরাজ করত এবং পৃথিবীর বুকে ভয় ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিল।[২]

আরবদের দৃষ্টিতে মানুষের মূল্য ও মূল্যায়ন অতি তুচ্ছ ছিল। ফলে, যুদ্ধ ও রক্তের হোলিখেলা তাদের নেশায় পরিণত হয়েছিল। অনেক সময় সাধারণ কোন তুচ্ছ ঘটনা তাদের কাছে যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়াত। আর এ কারণে বনী ওয়ায়লের দু'টি গোত্র বনী বকর ও বনী তাগলিব-এর মাঝে চল্লিশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত ছিল যেখানে পানির মত রক্তের বন্যা বয়ে গেছে। বস্তুত এ যুদ্ধের কারণ শুধু এতটুকু যে, সা'দ গোত্রের নেতা কুলাইব অপর গোত্রের মুনকিযের কন্যা বসূস-এর উটনীর স্তনে তীর মেরেছিল। ফলে এর রক্ত ও দুধ মিশে গিয়েছিল। এ কারণে জাস্‌সাস ইবন মুররাহ তাকে (কুলাইবকে) হত্যা করে। ফলে বকর ও তাগলিব গোত্রদ্বয়ের মাঝে যুদ্ধ বেঁধে যায়। এ গৃহযুদ্ধের ব্যাপারে কুলাইব-এর ভাই আল-মুহালহাল বলেন :

"মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে, মায়েরা সন্তানহীন হয়ে গেছে, শিশুরা ইয়াতীম হয়ে গেছে, অবিরাম অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে আর মানুষের লাশ দাফন-কাফনহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে।"

---

১. Encyclopedia of World History Wiliiam l. Langer
২. উইলিয়াম এল.ল্যাঙ্গার : এনসাইক্লোপিডিয়া, সাধারণ ইতিহাস

এমন ভাবে দাহিস ও গাবারা নামক যুদ্ধের কারণ ছিল, কায়েস ইবন যুহায়রের দাহিস নামে একটি ঘোড়া ছিল। এ ঘোড়াটি কায়েস ও হুযায়ফা ইবন বদরের মধ্যে প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হয়ে যায়। এ কারণে হুযায়ফার ইঙ্গিতে আসাদী গোত্রের এক ব্যক্তি ঘোড়াটিকে বিরক্ত করে এবং সেটার মুখে থাপ্পড় মারে। এতে ঘোড়াটি পিছনে পড়ে যায়।

এ ঘটনার কারণে হত্যা ও প্রতিশোধ, গৃহযুদ্ধ, আটক ও বন্দী এবং বিভিন্ন কবীলার দেশত্যাগের ধারা শুরু হয়ে যায়। এ ঘটনায় হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগের গাযওয়া ও যুদ্ধের সংখ্যা সর্ব সাকুল্যে সাতাশ থেকে আটাশটি। আর সারিয়া যুদ্ধের সংখ্যা হল সর্বোচ্চ ষাটটি। এ সকল যুদ্ধের ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, এ যুদ্ধগুলোতে সর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ রক্ত ক্ষয় হয়েছে। এ সকল যুদ্ধে উভয়পক্ষে মোট ১,০১৮ ব্যক্তি নিহত হয়েছে। কারণ, ঐ যুদ্ধগুলোর উদ্দেশ্য ছিল মানব জীবনের হিফাযত ও মানবস্বার্থ রক্ষা করা। ফলে, তারা আদব-আখলাক, শিষ্টাচারমূলক শিক্ষার প্রতি পূর্ণ অনুগত ছিলেন। কারণ ইসলাম যুদ্ধের ময়দানেও 'আযাবের পরিবর্তে আদব-সম্মানের নির্দেশ প্রদান করে।[২]

ইসলাম স্বীয় ঈমানী, আখলাকী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার এমন আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল যাদ্বারা একজন মুসলমান খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে যায়। ফলে, ঈমানদার কখনো মানুষকে কোন অবস্থায় পশুর কাতারে নামায় না এবং তার সাথে কখনো পশুসুলভ আচরণ করা পছন্দ করে না; আর নিজের ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের কারণে অন্যকে গোলামে পরিণত করে না। তারা নিজের এবং অন্য কোন মুসলমানের মাঝে পার্থক্য অনুভব করে না যে, তাদের সাথে কোন অপমানজনক আচরণ করবে। এ ক্ষেত্রে নমুনা হিসেবে একটি চমকপ্রদ ঘটনা উল্লেখ করা হলো :

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, "আমরা একবার হযরত উমর (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। ইতিমধ্যে মিসরের একজন কিবতী নাগরিক তার কাছে ফরিয়াদ (নালিশ) করল। হযরত উমর (রা) বিস্তারিত জানতে চাইলে

---

১. দেখুন আয়্যামুল আরব।

২. সেনাবাহিনী প্রেরণ করার সময় নবী (সা)-এর নির্দেশনার ব্যাপারে সীরাত ও হাদীসের কিতাবসমূহ দেখা যেতে পারে । বিস্তরিত জানার জন্য এ লেখকের পুস্তক 'নবী-এ রহমত' দ্বিতীয় খন্ডে 'গাযাওয়াত পর এক নযর' অধ্যায়, পৃঃ ১১৫ দ্রষ্টব্য

মিসরী বলে, মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আস (রা) সেখানে ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। এ প্রতিযোগিতায় আমার ঘোড়া অগ্রগামী হয়। লোকেরা তা প্রত্যক্ষও করেছে। কিন্তু গভর্নর পুত্র মুহাম্মদ বলে উঠে, আল্লাহ্‌র কসম! এটি আমার ঘোড়া। কিন্তু যখন তা নিকটে এলো, তখন তা চিনে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! এটি আমার ঘোড়া। এ কথা বলার কারণে সে আমাকে চাবুক দ্বারা প্রহার করতে লাগল। আর বলতে লাগল, বেটা জানিস না, 'আমরা ইবনুল আকরামান' (ভদ্রঘরের সন্তান)।

এ কথা শুনে হযরত উমর (রা) তাকে অপেক্ষা করতে বলে আমর ইবনুল আস-এর নিকট লিখলেন- "আমার পত্র পাওয়ামাত্রই তুমি এবং তোমার পুত্র মুহাম্মদ আমার নিকট হাজির হবে।"

বর্ণনাকারী বলেন, "আমর ইবনুল আস-এর নিকট পত্র পৌঁছার পর তিনি পুত্র মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি কোন অপরাধ করেছ? সে উত্তরে বলে, না! এতে তিনি বলেন, তাহলে কেন হযরত উমর (রা) তোমার ব্যাপারে লিখলেন? এরপরেই তাঁরা হযরত উমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন।"

হযরত আনাস (রা) বলেন, "আমরা হযরত উমর (রা)-এর কাছেই বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে দেখতে পেলাম, আমর ইবনুল আস (রা) একটি লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করে উপস্থিত হচ্ছেন। তখন হযরত উমর (রা) দেখতে লাগলেন যে, তার সাথে পুত্র আসছে কিনা, অথচ সে পিছে পিছেই আসছিল।

তারা উপস্থিত হলে হযরত উমর (রা) বলেন, অভিযোগকারী মিসরী কোথায়? মিসরী বলল, জী হ্যাঁ, আমি এখানে। তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন যাও, ইবনুল আকরামানকে কোড়া দ্বারা প্রতিশোধ নাও।"

বর্ণনাকারী বলেন, "সে তাকে খুব ভাল করেই পিটাল। অতঃপর হযরত উমর (রা) তাকে বললেন, যাও, আমরের মাথায় কয়েক ঘা দিয়ে দাও। কেননা তার কর্তৃত্বের কারণেই তো সে তোমাকে মারতে পেরেছে। মিসরী বলল, যে আমাকে প্রহার করেছিল, আমি তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি। এতে হযরত উমর (রা) বলেন, যদি তুমি মারতে, তাহলে আমি তাতে বাধা দিতাম না যতক্ষণ না তুমি নিজে ছেড়ে দিতে। তারপর বললেন, হে আমর! তোমরা লোকদেরকে কবে থেকে গোলাম বানিয়ে নিয়েছ? অথচ তাদের মায়েরা তাদেরকে আযাদ ও স্বাধীনরূপে জন্ম দিয়েছে। অতঃপর মিসরীর দিকে মুখ করে বললেন, নির্ভয়ে ফিরে যাও। যদি আবার কোন ঘটনা ঘটে, তাহলে আমাকে লিখো।"[১]

---

১. সীরাতে উমর ইবনুল খাত্তাব, ইবনুল জাওযী - পৃঃ ৮৬- ৮৭

নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও তার অধিকার পুনরুদ্ধার

ইসলাম-পূর্ব সময়ে নারী জাতির অবস্থা

এখানে আমরা প্রথমে ভূমিকাস্বরূপ কিছু কথা আলোচনা করতে চাই। ইসলাম নারীর কল্যাণে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা বোঝার জন্য এর প্রয়োজন রয়েছে। এখানে বিশিষ্ট আরব পণ্ডিত উস্তাদ আব্বাস মাহমূদ আল-আককাদ রচিত 'আল-মারআতু ফিল কুরআন' গ্রন্থ হতে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করতে চাই। যাতে এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণামূলক পর্যালোচনা রয়েছে।

উক্ত লেখক ইসলামের পূর্বে ধর্ম ও সমাজব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন :

"ভারতীয় সমাজে মনু[১] শাস্ত্রে পিতা, স্বামী অথবা উভয়ের মৃত্যুর পর পুত্র থেকে পৃথক থাকা নারীর স্বতন্ত্র কোন অধিকার স্বীকার করা হয়নি। আর তাদের সকলের মৃত্যুর পর নারীকে তার স্বামীর কোন নিকটাত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা ছিল বাধ্যতামূলক। নারী কোন অবস্থায় নিজ কর্মকাণ্ডে স্বাধীন হতে পারত না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার অধিকার খর্ব হওয়া থেকে অধিক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার স্বামী হতে তার পৃথক জীবন অস্বীকারের আকারে। সেমতে স্বামীর মৃত্যু দিবসে তাকে মৃত্যুবরণ করা এবং তাকে স্বামীর চিতায় সহমরণ বরণ করা বা সতীদাহ অত্যাবশ্যক ছিল। এ প্রাচীন রীতি ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রাচীনকাল হতে সতের শতাব্দী পর্যন্ত বহাল ছিল। এরপরে ধর্মীয় সংস্থাসমূহের অপছন্দ সত্ত্বেও তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।"[২]

---

১. এটি হিন্দু সম্প্রদায়ের সমাজ ও পারিবারিক আইনের উৎস হিসেবে বিবেচিত। তার ব্যক্তিত্বের উপর অজ্ঞতা, অনুমান ও পবিত্রতার পর্দা পড়ে রয়েছে। ফলে তার যুগ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়নি এবং তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও জানা সম্ভব হয়নি।

২. হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ বেদ-এ তাকে অতি মানব দেখানো হয়েছে। এর কোন কোন ভাষ্যমতে তাকে মানব জাতির আদিপিতা ও বিশ্বস্রষ্টার প্রথম অবতার বলে মনে হয়। আর এ নাম ও বৈশিষ্ট্য সনাতন ভারতের বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
মনু স্মৃতি, যাকে পুরাতন ভারতের সামাজিক ও পারিবারিক সংবিধান বলে মনে করা হয়, তাও গো মহারাজ (পুরাতন ভারতের একজন বড় আইনবিদ)-এর রচিত বলে মনে করা হয়। তিনি নিজেকে মনু-এর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার বলে দাবি করতেন। যাই হোক, মনু

হামুরাবী[১] ধর্মীয় বিধানে (যে কারণে বাবেল শহর প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল) নারী জাতিকে গৃহপালিত পশুর মত মনে করা হতো। আর তাদের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদার ধারণা এ থেকে পাওয়া যায় যে, তাদের নিয়মানুসারে যদি কেউ কারো কন্যাকে হত্যা করত, তাহলে হত্যাকারী তার মেয়েকে নিহতের পরিবর্তে হস্তান্তর করত, যাতে নিহতের অভিভাবক তাকে হত্যা করে, কিংবা দাসী বানিয়ে নেয় অথবা ক্ষমা করে দেয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধান মান্য করতে গিয়ে হত্যাই করা হতো।

প্রাচীন গ্রীসে স্ত্রীজাতি সব ধরনের অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ছিল। তাদের এমন একটি বড় ঘরে থাকতে দেয়া হতো যা রাস্তা থেকে দূরে এবং স্বল্পসংখ্যক জানালা বিশিষ্ট হতো। এর দরজায় পাহারাদার নিযুক্ত থাকতো। স্ত্রীগণ ও পরিবারের মহিলাগণের প্রতি অনাগ্রহের কারণে গ্রীসের বড় বড় শহরে এ ধরনের সমাবেশের সাধারণ প্রচলন ছিল– যেখানে গায়িকা এবং সুন্দরী নারীদের দ্বারা চিত্তাকর্ষণ করা হতো। ধর্মীয় সভা-সমাবেশে পুরুষের সাথে মহিলদের অংশগ্রহণের অনুমতি খুব কমই পাওয়া যেত। একইভাবে দার্শনিকদের পরিমন্ডলে নারী শূন্যই দেখা যেত। কর্মজীবী নারী কিংবা তালাক-প্রাপ্তাগণ ছিল বাঁদীর ন্যায়, সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের মর্যাদা তাদের ছিল না। এরিস্টটল স্পার্টাবাসীদের ব্যাপারে প্রতিবাদ করতেন যে, তারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে নরম ব্যবহার করে এবং তারা তাদেরকে উত্তরাধিকার, তালাক এবং স্বাধীনতার অধিকার দিয়ে রেখেছ। ফলে তারা উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। তিনি স্পার্টার পতন এবং ধ্বংসকে নারীদের অবাধ স্বাধীনতা দানের ফলশ্রুতি বলে মনে করতেন।

প্রাচীন রোমান মহিলাদের সাথে আচরণ প্রাচীন ভারতেরই অনুরূপ ছিল। তারা জীবনভর পিতা-স্বামী এবং পুত্রের অধীনে থাকতো। নিজেদের সাংস্কৃতিক উত্থানের ফলে তাদের ধারণা ছিল, না নারীর শিকল কাটা যায় আর না তার কাঁধ হতে জোয়াল নামানো যায়। তাই কাটুর উক্তি ছিল "Nungham Exvitur

---

স্মৃতিকে পুরাতন ভারতের সবচেয়ে সনাতন সাংবিধানিক গ্রন্থ বলে মনে করা হয় এবং অধিকাংশ গবেষকের ধারণামতে এ গ্রন্থ খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত হয়েছে। (এ টীকার ক্ষেত্রে ডঃ গঙ্গানাথ ঝা ও ডঃ জীসাওয়াল-এর গ্রন্থ হতে সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। তারা ভারতের আইন ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত)

১. হামুরাবী : ইরাকের শাসক বংশের একজন প্রসিদ্ধ শাসক, যিনি একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন । খ্রিঃ পূঃ ৩০০০ সালে তিনি ইরাকের শাসক ছিলেন।

Servitus Mulie Brio"–এ বন্দীদশা থেকে রোমান নারী কেবল সেই সময় মুক্ত হতে পেরেছিল যখন বিদ্রোহ এবং অবাধ্যাচরণ করে রোমান দাস শ্রেণী মুক্ত হয়েছিল। আর তখনই মহিলাদের দাসী হিসেবে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

উস্তাদ আক্কাদ প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতায় মহিলাদের কিছু অধিকার ও স্বাধীনতার কথা আলোচনা করার পর উল্লেখ করেন–

"ইসলামের পূর্বে মিসরীয় সভ্যতা ও তাদের নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন শেষ হয়ে যায় এবং মধ্যপ্রাচ্যে সে সময়ে রোমান সভ্যতার পতন এবং তাদের আয়েসী জীবন ও জীবন উপভোগের ফল স্বরূপ পার্থিব জীবনের ব্যাপারে ঘৃণা করার মেজাজ সৃষ্টি হয়েছিল; এবং জীবন ও পরিবার-পরিজন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার মানসিকতা তৈরি হয়েছিল। তাদের দুনিয়াবিমুখ চিন্তা-চেতনা দেহ ও নারীকে অপবিত্র মনে করছিল এবং নারীকে পাপের মূল বলে সাব্যস্ত করেছিল। তারা প্রয়োজন ছাড়া তাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকাকে ভালো মনে করছিল।

এটা মধ্যযুগের ঐ সকল চিন্তারই প্রভাব ছিল, এবং তা পনের শতাব্দী পর্যন্ত কিছু কিছু ধর্মীয় ব্যক্তির চিন্তা ছিল– যারা মহিলাদের প্রকৃতির ব্যাপারে অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করত। তারা মাকন (Macon)-এর সভাতে এ প্রশ্ন উঠিয়েছিল যে, নারী প্রাণহীন দেহ, নাকি প্রাণবিশিষ্ট দেহ যার সাথে মুক্তি পাওয়া বা ধ্বংসের সম্পর্ক থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশের মত ছিল যে, তাদের দেহ মুক্তি পাওয়ার যোগ্য রূহশূন্য, তবে শুধু হযরত ঈসা (আ)-এর মাতা কুমারী মরিয়মের বিষয়টি ভিন্ন।

রোমান যুগের ঐ চিন্তা-চেতনা পরবর্তীতে মিসরীয় সভ্যতায় মহিলাদের অবস্থানকে প্রভাবিত করে। মিসরীদের উপর রোমানদের কঠিন জুলুম-অত্যাচার তাদের সন্ন্যাসী ও দুনিয়াবিমুখ হওয়ার কারণে পরিণত হয়েছিল। ফলে, অসংখ্য দুনিয়াবিমুখ লোক সংসার ত্যাগ করাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের উপায় বলে মনে করত এবং শয়তানের ধোঁকা থেকে (যাদের মধ্যে নারী সর্বপ্রথম) দূরে থাকার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করত।

অসংখ্য পশ্চিমা ঐতিহাসিক এ অপবাদ দেয় যে, ইসলাম তার বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শরী'আত হতে, বিশেষত মূসা (আ)-এর শরী'আত থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করেছে। তাদের এ দাবি বাতিল প্রমাণিত হওয়ার জন্য তাওরাতী শরী'আত ও কুরআনী শরী'আতের মাঝে নারীদের যে মর্যাদা রয়েছে, তা তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা মূসা

(আ)-এর সাথে সম্পৃক্ত কিতাবের শিক্ষা অনুযায়ী মেয়ে পিতার মীরাস থেকে বঞ্চিত হয় যদি তার পুত্র সন্তান থাকে।

এটা ঐ দানের অন্তর্ভুক্ত, যা পিতা তার জীবদ্দশায় অবলম্বন করে থাকে যাতে মৃত্যুর পর শরী'আতের চূড়ান্ত বিধানের মত মীরাস যেন ওয়াজিব না হয়ে যায়।

মীরাসের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান হলো যতক্ষণ পুত্র সন্তান থাকবে, কন্যা মীরাস হতে বঞ্চিত হবে। যদি কোনো কন্যা মীরাসের অধিকারী হয়, তাহলে তার অন্য গোত্রে বিবাহ করার অনুমতি নেই এবং তার জন্য মীরাসের সম্পদ অন্যত্র নিয়ে যাওয়ারও অনুমতি নেই। এ নির্দেশ তাওরাতের অসংখ্য স্থানে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এখন আমি ঐ পুণ্যভূমির কথা আলোচনা করব, যেখানে পবিত্র কুরআনের দাওয়াত শুরু হয়েছিল। সে পুণ্যভূমি হলো আরব উপসাগরীয় দেশসমূহ। আপনার সে দেশের প্রতি আশা রাখা উচিত নয় যে, হয়ত সেখানে নারীদের সাথে সদাচরণ ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করা হত। বরং আরব দেশের অনেক অঞ্চলে নারীদের সাথে পৃথিবীর অন্য সকল দেশের তুলনায় অধিক জুলুম-নির্যাতন করা হত। আর যদি তার সাথে কোথাও সদাচারণ করা হত এবং তার স্বামীর ঘরে মর্যাদার সাথে থাকত, তাহলে তা এজন্য যে, উক্ত নারী হয়ত কোন প্রতাপশালী আমীরের কন্যা অথবা কোন প্রিয় সন্তানের মা। কিন্তু শুধু নারী হিসেবে তার সম্মান করা হত না যে, সে নারী এবং সে হিসেবে অধিকার পাওয়ার যোগ্য।

এ আশা করা করা উচিত হবে না যে, পিতা, স্বামী, ভাই এবং পুত্র তাকে অন্য সকল মালিকানাধীন বস্তুর মত বা তার হিফাযতে থাকা বস্তুর মতই হিফাযত করত। কারণ আরব সমাজে এটা মানুষের জন্য লজ্জার কারণ ছিল যে, তার অন্দরমহলের অপদস্থ করা হয়– যেমনি তার হিফাযতে থাকা বা তার সংরক্ষিত বস্তুর উপর অযাচিত হস্তক্ষেপ দূষণীয় ছিল। ঐ সকল বস্তুর মধ্যে তার ঘোড়া, পালিত পশু, কূপ, চারণভূমিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। নারী ঐ সকল মাল-সম্পদ ও চতুষ্পদ জন্তুর সাথে মীরাস হিসেবে হস্তান্তর হত। কখনো লোকেরা লজ্জার কারণে নিজের কন্যা সন্তানকে শিশুকালেই জীবন্ত সমাধিস্থ করত এবং তার জন্য ব্যয় করা বোঝা মনে করত। অথচ নিজের বাঁদী ও উপকারী প্রাণীর জন্য খরচ করাকে বোঝা মনে করা হতো না। আর যে কন্যার জীবন রক্ষা করত অথবা শৈশবে তার জন্য খরচ করত, সেটা তার দৃষ্টিতে মীরাসের মূল্য ছিল যা পিতা

হতে পুত্রের নিকট হস্তান্তর হতো। ঋণ ও সুদ পরিশোধের জন্য কন্যা সন্তানকে বিক্রি করা বা বন্ধক রাখা যেত। কন্যা সন্তানেরা এ ভয়ংকর পরিণতি হতে কেবল তখনই মুক্তি পেত যখন সে কোন সম্ভ্রান্ত গোত্রের সদস্য হত যার নিরাপত্তা ও নিকটত্মীয়তার বিশেষ গুরুত্ব ছিল।[১]

বৌদ্ধ ধর্মে নারী

বৌদ্ধ ধর্মে নারীদের ব্যাপারে যে ধারণা পোষণ করা হয় সে সম্পর্কে ধর্ম ও আখলাক বিষয়ক বিশ্বকোষের প্রবন্ধকার একজন বৌদ্ধ ধর্মীয় পণ্ডিতের (Chullay Agga) মতামত নমুনা হিসেবে পেশ করেছেন এবং উক্তিকে ওল্ডেনবার্গ (Oldenberg) স্বীয় গ্রন্থ বৌদ্ধ (Buddha)-তে উল্লেখ করেছেন।

"পানির ভিতর থাকা মাছের মনোভাব বোঝা যেমন সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি স্ত্রীলোকের মনোভাব ও প্রকৃতি বোঝা সম্ভব নয়। তাদের কাছে চোরদের মত অসংখ্য অস্ত্র থাকে এবং তাদের নিকট সত্যের কোন নাম-গন্ধ থাকে না।"[২]

হিন্দু ধর্মে নারী

উল্লিখিত বিশ্বকোষের প্রবন্ধকার হিন্দু ধর্মে নারীর ব্যাপারে ধারণা সম্পর্কে উল্লেখ করেন :

"ব্রাহ্মণ্যবাদে বিবাহের অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। প্রতিটি মানুষের জন্য বিবাহ জরুরী। কিন্তু মনুর বিধান অনুযায়ী স্বামী হলো নারীর মুকুট। তাই স্বামীকে নারাজ করার মত কোন আচরণ তার করা উচিত নয়। এমনকি যদি স্বামী অন্য মহিলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে কিংবা মৃত্যুবরণ করে, তবুও সে অন্য কোন পুরুষের নাম মুখে উচ্চারণ করতে পারবে না। যদি মহিলা দ্বিতীয় বিবাহ করে, তাহলে সে স্বর্গ হতে বঞ্চিত হবে, যেখানে তার প্রথম স্বামী অবস্থান করছে। স্ত্রী অবাধ্য হলে তাকে অতি নির্মম শাস্তি দেয়া যেতে পারে। নারী কখনোই স্বাধীন হতে পারে না। সে মীরাস পাবে না। স্বামীর মৃত্যুর পর তাকে সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের অধীনে জীবন যাপন করতে হবে। স্বামী ইচ্ছা করলে আপন স্ত্রীকে লাঠিদ্বারা পেটাতে পারে।"[৩]

---

১. আল মারআতু ফিল কুরআন: আল উস্তাদ আব্বাস মাহমূদ আককাদ, পৃ: ৫১-৫৭

২. Encyclopedia of Religion and Ethics. Vol. V.P. 271. NewYork-1912.

৩. প্রাগুক্ত– Vol. V.P. 271.

ইউনিভার্সেল হিস্ট্রি অব দ্য ওয়ার্ল্ড গ্রন্থে মি, রে, স্ট্রেচী (Ray Strachey) ভারত সম্পর্কে উল্লেখ করেন :

"ঋগ্বেদে (যাতে মানবজাতির প্রথম পূর্বপুরুষের আলোচনাও রয়েছে) নারীকে অত্যন্ত নিম্ন ও মর্যাদাহীন অবস্থান প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে এটি মনে করা হতে লাগল যে, তারা রূহানী দিক (আধ্যাত্মিক দিক) থেকেও অযোগ্য, বরং প্রায় প্রাণহীন জীবের মত। মৃত্যুর পর তারা পুরুষের পুণ্য ছাড়া স্থায়িত্ব লাভে সক্ষম নয়। তাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা খতমকারী ধর্মের পাশাপাশি সামাজিক রীতিনীতির বেড়ি (যা ধীরে ধীর সৃষ্টি হয়েছে) এটি অসম্ভব করে তুলেছিল যে, নারী কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বকে জন্ম দিতে পারে। নারীর জন্মদাতা মনু তাদেরকে নিজের ঘর, বিছানা, অলংকারের আসক্তি, কু-প্রবৃত্তি, ক্রোধ, বেঈমানী ও অসংখ্য কুপ্রবণতা দান করেছে। নারী এতটাই খারাপ যেমন মিথ্যা, এটি একটি সর্বজনস্বীকৃত সত্য ছিল। পুরুষকে দুনিয়াতে ভুল পথে পরিচালিত করা নারী স্বভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর এ কারণেই জ্ঞানীরা নারীদের সংস্পর্শে নিঃসংশয়ে বসেন না।

বাল্যবিবাহ প্রথা, বিধবাদের প্রতি ঘৃণা, সতীদাহ ও পর্দা, এমন এক সমাজের স্বাভাবিক চিত্র যেখানে সন্তান জন্ম দেয়া প্রাণী ছাড়া নারীর আর কোন বিশেষ অবস্থান নেই। সম্ভবত নবজাতক কন্যা শিশুর মৃত্যু ঐ সমাজে কোন বিশেষ অবস্থানে নেই। হয়তো নবজাতক কন্যা শিশুর মৃত্যু ঐ সমাজের জন্য কল্যাণকর হবে; যেখানে তার প্রতি সন্দেহ, খারাপের মূল উৎস, ধোঁকাবাজ, স্বর্গের রাস্তার প্রতিবন্ধক এবং নরকের দরজা মনে করা হত।"[১]

চীনে নারী

মিঃ রে-স্ট্রেচী চীনে নারীর অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখ করেন :

"দূরপ্রাচ্য অর্থাৎ চীনে নারীর অবস্থা তা হতে উত্তম ছিল না। ছোট বালিকাদের পায়ে কাষ্ঠ বিদ্ধ করার প্রথার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাকে অসহায় ও দুর্বল করে রাখা। এ প্রথা যদিও অভিজাত ও ধনিক শ্রেণীর মাঝে প্রচলিত ছিল কিন্তু তা দ্বারা 'ঐশী শাসন' যুগে নারীর অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।"[২]

---

১. Universal History of the World. E G. J.A Hamerton. Vol 1,o.378 (Lodon)
২. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮

বৃটিশ সমাজে নারী

উল্লিখিত প্রবন্ধকার বৃটিশ সমাজে নারীর অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন :

"সেখানে নারীকে সকল প্রকার নাগরিক অধিকার হতে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। শিক্ষার দরজা তার জন্য বন্ধ ছিল, শুধুমাত্র নিম্নমানের শ্রমিক হওয়া ছাড়া তার অন্য কাজ করার অধিকার ছিল না। বিবাহের সময় তার সকল ধন-সম্পদ হতে হাত গুটিয়ে নিতে হত।

এটা বলা যেতে পারে যে, মধ্যযুগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নারীকে যে মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে, তা থেকে কোনো কল্যাণের আশা করা যেত না।[১]

ইসলামি শিক্ষা

আপনি উল্লিখিত শিক্ষাকে ইসলামের এক নতুন ও স্বতন্ত্র ভূমিকার সাথে তুলনা করুন, যা নারীর মর্যাদা ও তার অবস্থানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে এবং মানব সমাজে তাকে উপযুক্ত স্থান প্রদানে, অত্যাচারমূলক নিয়ম-নীতি, অন্যায়-অবিচারমূলক প্রথা ও সামাজিক রীতি এবং পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা ও অহংকার থেকে মুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পবিত্র কুরআনের উপর যদি কেউ একবার স্বাভাবিক দৃষ্টিপাত করেন, তাহলে তিনি নারীর ব্যাপারে জাহিলী দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য সহজেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন, যার সাথে ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহার ও সামাজিক রীতি-নীতি সম্পৃক্ত।

পবিত্র কুরআনের আয়াত যা অর্ধ মানব গোষ্ঠী ও নাজুক প্রজাতির ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, তা নারী জাতিকে এজন্যে আত্মবিশ্বাসী করতে সক্ষম যে, তদনুযায়ী সমাজে ও আল্লাহ্‌র নিকট তার জন্য সুনির্ধারিত স্থান রয়েছে। ফলে সে দ্বীন ও ইলম, ইসলামের খিদমত, কল্যাণ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগী এবং একটি কল্যাণকর সমাজ গড়তে পূর্ণ অংশগ্রহণ করতে পারে।

পবিত্র কুরআনে আমল গ্রহণ হওয়া এবং মুক্তি ও সৌভাগ্য এবং আখিরাতের সফলতার বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বদাই পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا۔

১. প্রাগুক্ত

"যে কেউ নেক আমল করবে, হোক সে পুরুষ বা নারী এবং সে যদি ঈমানদার হয় তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণ জুলুম করা হবে না।" [সূরা নিসা : ১২৪]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔

"অতঃপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কর্মে নিষ্ঠ কোন পুরুষ ও নারীর আমল নষ্ট করব না, তোমরা একে অপরের অংশ।" [সূরা আলে ইমরান : ১৯৫]

এভাবে পবিত্র কুরআনে শান্তিময় জীবনের সুযোগ ও উপকরণদানের ক্ষেত্রেও পুরুষের সাথে নারীকেও স্মরণ রেখেছেন, এবং তাদের শান্তিময় জীবনের ওয়াদা করেছেন এবং তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বস্তুত 'হায়াতে তায়্যিবা' একটি গভীর অর্থবোধক শব্দ। তাতে রয়েছে আদর্শ ও সফল জীবনের অর্থ এবং ইজ্জত, সম্মান, শান্তি ও নিরাপত্তার সীমাহীন অর্থ। ইরশাদ হচ্ছে :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

"পুরুষ ও নারী কেউ যদি ঈমান গ্রহণের পর সৎকর্ম করে, তাহলে তাকে অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান প্রদান করব।" [সূরা নাহল : ৯৭]

উত্তম গুণাবলী, নেক আমল এবং দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ শাখাসমূহ আলোচনা করার সময় পবিত্র কুরআন পুরুষের সাথে নারীদের আলোচনা এবং এ ইশারা করাকেই যথেষ্ট মনে করেনি যে, নেক আমল ও উত্তম গুণাবলীর ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। বরং এর বিপরীত এক-একটি বৈশিষ্ট্যকে পৃথক পৃথক আলোচনা করেছে এবং যখন পুরুষদের জন্য কোন উত্তম আমল ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করেছে, তখন ঐ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সাথে নারীদেরকেও গুণান্বিত করেছে এবং তাদের পৃথক আলোচনা করেছে যদিও এর জন্য দীর্ঘ অনুচ্ছেদ গ্রহণের প্রয়োজন হয়।

এর হিকমত হলো এই যে, ঐ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষদের সাথে নারীদের যোগ্যতার অনুমান করতে মানুষের

আকল প্রস্তুত ছিল না– যারা তৎকালীন মানুষের আকল-বুদ্ধি অনৈসলামী ধর্ম-দর্শন ও পুরাতন সমাজ ও রীতির ছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছিল। আর এ ধরনের মন-মানসিকতা সবর্দা নারী-পুরুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং তারা এমন অসংখ্য গুণের ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে নারীকে শরীক করা থেকে বিরত থাকে। এ ক্ষেত্রে নারীর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও অগ্রসর হওয়ার বিষয় তো প্রশ্নই আসে না। এখন আপনি আমার সাথে পবিত্র কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করুন :

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۔

"নিঃসন্দেহে যারা মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, সাদকাকারী পুরুষ ও সাদকাকারী নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী এবং নিজেদের লজ্জাস্থান হিফাযতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থান হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্‌র অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও আল্লাহ্‌র অধিক যিকিরকারী নারী, আল্লাহ্ তাদের জন্য ক্ষমা ও বড় প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।" [সূরা আহযাব : ৩৫]

পবিত্র কুরআন শুধু যে ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রেই তাদের আলোচনা করেছে এমন নয়; বরং যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষ, আলিম, দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, দ্বীনি ও আখলাকী, ধর্মীয় ও নৈতিকতার জবাবদিহিতামূলক কর্মতৎপরতা এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের ক্ষেত্রে অসংখ্য কষ্ট-ক্লেশ সহ্যকারীদের সাথেও তাদের আলোচনা করা হয়েছে এবং পরিশেষে মুমিন নারী ও পুরুষের একটি ঐক্যবদ্ধ এবং কল্যাণ ও তাকওয়ার পথে পরস্পর সহযোগিতা-কারী জামাতরূপে দেখতে চেয়েছে। যেমন :

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ أُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۔

"ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অন্যের বন্ধু ও সহযোগী। তারা সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎকাজে নিষেধ করে। তারা নামাযে পাবন্দী করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরাই এমন লোক যাদের উপর আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও বড় হিকমতওয়ালা।" [সূরা তাওবা : ৭১]

পবিত্র কুরআন মানব মর্যাদার সুউচ্চ স্তরে পৌছাবার এবং তার পূর্ণতা লাভের মাধ্যম হিসেবে লিঙ্গ, জাতি ও বর্ণকে গ্রহণ করেনি; বরং এর মাধ্যম হিসেবে তাকওয়াকে গ্রহণ করেছে। বলা হয়েছে :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ـ

"হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে একটি পুরুষ ও একটি নারী হতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। আর নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য হতে আল্লাহ্র নিকট অধিক সম্মানিত ব্যক্তি সেই– যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্কে অধিক ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অধিক জ্ঞাত এবং সবকিছুর খবর রাখেন।" [সূরা হুজুরাত : ১৩]

এ সকল আলোচনা নারী জাতির মাঝে সাহসিকতা, আত্মবিশ্বাস, আত্মচেতনা এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় হীনম্মন্যতা (Inferiority Complex) থেকে দূরে রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত যথেষ্ট হবে।

এ সকল শিক্ষাব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে মুহাম্মাদুর রাসূল (সা)-এর পর হতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ইসলামের বিখ্যাত রমণীগণের মধ্য হতে শিক্ষিকা, উত্তম প্রশিক্ষণদানকারিণী, জিহাদ ও পরিচর্যাকারিণী, সাহিত্যিক, লেখিকা, পবিত্র কুরআনের হাফেজা, হাদীস বর্ণনাকারী, আবেদা, যাহেদা এবং সমাজে মর্যাদা ও গুরুত্বের অধিকারী রমণীর বিরাট সংখ্যা নজরে পড়ে– যাদের কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হয়েছে এবং যারা সুউচ্চ ও আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।[১]

ঐ সকল অধিকার– যা ইসলাম মুসলিম নারীদেরকে প্রদান করেছে, সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো, মালিকানা ও মীরাসের অধিকার, ব্যবসা-

১. এ ব্যাপারে বিখ্যাত নারীদের জীবনী দেখা যেতে পারে।

বাণিজ্যের অধিকার, প্রয়োজন হলে স্বামীর কাছ থেকে খোলা তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার, বিয়েতে রাযী না হলে তা নাকচ করার অধিকার, ঈদ ও জুমু'আ জামাতে শরীক হবার অধিকার; এ ছাড়া অন্যান্য অধিকার রয়েছে যার বিবরণ ফিকহের গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান।

পশ্চিমা পণ্ডিত ও ইনসাফপ্রিয় মনীষীদের সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি

অসংখ্য ইনসাফপ্রিয় পণ্ডিত এবং সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসের বিজ্ঞ ব্যক্তি কুরআন ও ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। কারণ, তা নারীর মর্যাদা ও তার অধিকার সংবলিত।

এখানে আমরা দু'-তিনটি সাক্ষ্য উল্লেখ করা যথেষ্ট মনে করব। এর মধ্যে একজন পশ্চিমা পণ্ডিত মহিলার স্বীকৃতি রয়েছে। তিনি ভারতে একটি শিক্ষা ও সংস্কার আন্দোলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং দক্ষিণ ভারতের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (থিয়োসুফিক্যাল সোসাইটি) প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেন। একজন মহিলার সাক্ষী এজন্যও গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান যে, তারা মহিলাদের বিষয়ে অত্যন্ত অনুভূতিশীল হয়ে থাকে এবং তারা মহিলাদের পক্ষ গ্রহণ করে তাদের পক্ষে সাফাই গাওয়ার ক্ষেত্রে আন্তরিক হয়। তিনি হলেন মিসেস এ্যানি বেসান্ত (Mrs. Annie Besant).

তিনি স্বরচিত গ্রন্থে লিখেছেন :

"আপনি এমন কিছু লোক দেখতে পাবেন যারা ইসলাম ধর্মের এজন্য সমালোচনা করে যে, ইসলাম সীমিত পরিসরে হলেও বহুবিবাহের অনুমতি প্রদান করেছে। কিন্তু তারা আমার ঐ সমালোচনা আপনাকে বলবে না– যা আমি লন্ডনের একটি হলরুমে এক সেমিনারে আলোচনা করেছিলাম। আমি সেখানে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলাম যে, একজন স্ত্রী থাকার পরে অসংখ্য মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া মুনাফিকী (Hypocrisy) এবং সীমিত পরিসরের বহু বিবাহ হতে অধিক অপমানকর। স্বাভাবিকভাবে মানুষ এ ধরনের আলোচনাকে দূষণীয় মনে করে। তারপরেও তাদের বলা উচিত। কারণ, আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, নারী সংক্রান্ত ইসলামি আইন এখনো পর্যন্ত ইংল্যান্ডে পালন করা হচ্ছে। কারণ, তা সর্বাধিক ন্যায়সংগত আইন– যা দুনিয়াতে বিদ্যমান। মীরাসের অধিকার ও তালাকের বিষয়েও তা পশ্চিমাদের থেকে অনেক অগ্রসর এবং নারীর অধিকার সংরক্ষণকারী। অথচ একবিবাহ ও বহুবিবাহ সম্পর্কিত শব্দসমূহ

মানুষকে যাদুগ্রস্ত করে রেখেছে। ফলে, তারা পশ্চিমা নারীদের ঐ অপমানকর জীবনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতে চায় না যাকে তার প্রথম সংরক্ষকগণ শুধু এজন্য রাস্তায় নিক্ষেপ করত যে, তার দ্বারা তাদের মন ভরে গেছে। অতঃপর তারা তাদের কোনো সহযোগিতা করত না।"[১]

মিঃ এন, এল, কোলসেন (MR. N. L. Coulsen) লিখেছেন :

"নিঃসন্দেহে নারী বিষয়ে, বিশেষ করে বিবাহিত নারীর ব্যাপারে কুরআনী আইন শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। বিবাহ এবং তালাক সম্পর্কিত অসংখ্য বিধান রয়েছে– যার সাধারণ উদ্দেশ্য হলো, নারীর মর্যাদা সমুন্নত করা। আর তা আরবদের আইন-কানুনে বিপ্লবী পরিবর্তনের প্রমাণ... তাকে পার্সোনাল ল'-এর মর্যাদা দান করেছে, যা ইতিপূর্বে ছিল না। তালাকের বিধানে কুরআন সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তন সাধন করেছে, তা হলো ইদ্দতকে তালাকের অন্তর্ভুক্ত করা।"[২]

ধর্ম ও সভ্যতা বিষয়ক বিশ্বকোষের প্রবন্ধকার লিখেছেন :

"ইসলামের নবী নিঃসন্দেহে নারীর মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছেন, যা সেই প্রাচীন আরব সমাজে পেত। বিশেষ করে স্বামীর মৃত্যুর পর নারী স্বামীর রেখে যাওয়া প্রাণীই থেকে যায়নি, বরং সে নিজে তার মীরাসের হকদার হয়ে যায় এবং অন্য স্বাধীন মহিলাদের মত তাকে দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে বাধ্য করা যেত না। সে বিবাহের সময় যে সকল বস্তু পেয়েছিল, তালাকের সময় তা প্রদান করতে তার স্বামী বাধ্য থাকে।

এছাড়াও সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কাব্যচর্চার প্রতি আগ্রহী হতে থাকে। কেউ কেউ শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিল। সাধারণ পরিবারে নারীরা নিজ গৃহে রাণীর মর্যাদায় এবং তার পরিবারের আনন্দ-বেদনায় শরীক হত। সর্বোপরি তাদেরকে মায়ের মর্যাদা দেয়া হত।"[৩]

নব জীবনের সূচনা এবং মহাবিপ্লব

পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং মুহাম্মদ (সা)-এর শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে নারীদের মর্যাদার এ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যেন মানব জগতে নারী জাতির নব জীবনের সূচনা করেছে। কারণ, আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ইসলাম-পূর্ব বিশ্বে

---

১. The Life is Teaching of Muhammad (SM) by Annie Besant (Modras 1932) p. 3.
2. A History of Islamic Law. (Edinburg 1971) p. 14.
৩. এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন এণ্ড ইথিক্স (নিউইয়র্ক ১৯১২) পৃঃ ২৭১

নারী এবং গৃহপালিত জন্তু বা জড় পদার্থের মাঝে কোন পার্থক্য ছিল না। তাদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া হত, বন্ধক রাখা হত অথবা গৃহের পুতুল মনে করা হত। এ পরিস্থিতিতে এ বিপ্লবী শিক্ষা ব্যবস্থা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আখলাক-চরিত্র ও নীতি নৈতিকতা, পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে একটি বরকতময় ঘটনা হিসেবে আবির্ভূত হয়, যাকে সকল দেশ ও সমাজ স্বাগত জানায়। বিশেষ করে ঐ সকল দেশ, যেখানে ইসলাম বিজয়ী বেশে প্রবেশ করে অথবা যেখানে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা বা ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রয়োগের সুযোগ এসেছিল। অথবা যেখানে ইসলাম একটি সংস্কারমূলক দাওয়াত ও বাস্তব নমুনা হিসেবে উপস্থিত হয়েছিল। ইসলামের এ মানবীয় অবদানের মূল্য ও মূল্যায়ন ঐ সকল দেশে সুস্পষ্ট, যেখানে বিধবাদেরকে মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় জ্বলতে হত এবং সমাজ তাদেরকে স্বামীর মৃত্যুর পর বাঁচার অধিকার দিত না এবং সে নিজেও নিজকে বেঁচে থাকার যোগ্য মনে করত না।

মুসলমান শাসকগণ নিজেদের শাসনামলে কিছু ভারতীয় রীতি-নীতির, বিশেষত সতীদাহ প্রথার এভাবে সংস্কার করে যে, যাতে তাদ্বারা তাদের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের ও ভারতীয় রীতি-নীতিতে ক্ষতি এবং তাতে তাদের অমর্যাদা সাধন না হয়। এক্ষেত্রে ফ্রান্সের বিশিষ্ট পর্যটক ও ডাক্তার বার্নিয়ার-এর উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। (তিনি সম্রাট শাহজাহানের সময় ভারত ভ্রমণ করেছিলেন) তিনি উল্লেখ করেন :

"পূর্বের তুলনায় আজকাল সতীদাহ প্রথা কমে গেছে। কারণ, মুসলমান শাসকগণ এ হিংস্র রীতি-নীতির মূলোৎপাটন করার ক্ষেত্রে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছেন যদিও তারা নিষেধাজ্ঞা জারি করার ক্ষেত্রে কোন আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। কারণ, তাদের রাষ্ট্রীয় নীতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় রীতি-নীতিতে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন মনে করতেন না বরং তাদের ধর্মীয় রীতি-নীতি পালন করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদান করতেন। তারপরেও তারা সতীদাহ প্রথাকে বিভিন্ন কৌশলে বাধাদান করার চেষ্টা করতেন। এমনকি তারা এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যে, কোন নারী আঞ্চলিক শাসকের অনুমতি ছাড়া সতীদাহ বরণ করতে পারবে না। আর আঞ্চলিক শাসকের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তারা কেবল তখনই অনুমতি প্রদান করবেন যখন তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হয় যে, এ মহিলা নিজের সিদ্ধান্ত হতে ফিরে আসবে না। এ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক শাসক তার সাথে আলোচনা করতেন,

তাকে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতেন, তাকে ভয় দেখাতেন এবং তার সাথে উত্তম আচরণের ওয়াদা করতেন। এরপরেও যদি তার বুঝ ও কৌশল কাজে না আসত, তখন তারা ঐ বিধবাকে অন্দর মহলে বেগমদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন যাতে বেগমগণ তাদেরকে বুঝিয়ে সতীদাহ হতে বিরত রাখতে পারে।

কিন্তু ঐ সকল চেষ্টা-কৌশলের পরেও এখনো সতীদাহ-এর সংখ্যা অনেক রয়ে গেছে; বিশেষ করে ঐ সকল অঞ্চলে– যেখানে হিন্দু রাজাগণ শাসনকার্য পরিচালনা করছে এবং যেখানে কোন মুসলমান শাসক নির্ধারিত নেই।"[১]

১. সফরনামা : ডাক্তার বার্নিয়ার: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৭২-১৭৪ (অমৃতসর ১৮৮৬)

হৃদয়ে হৃদয়ে ছেয়ে গেল আশা-আকাঙ্ক্ষার আলো, দূর হয়ে গেল হতাশাবোধ ও কুলক্ষণাভাব, ভরে গেল আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মমর্যাদাবোধের দীপ্তি

মানুষের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

মানব সভ্যতায় প্রিয় নবী (সা)-এর পঞ্চম অবদান হলো এই যে, ইতিপূর্বে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, মানুষের মনে নিখুঁত মানব প্রকৃতি সম্পর্কে এক রকম পাপবোধ সৃষ্টি হয়েছিল। এ বিশেষ মানসিকতা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে প্রাচ্যের কিছু প্রাচীন ধর্ম, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিকৃত খ্রিস্টধর্মের বড় ভূমিকা ছিল।

ভারতের প্রাচীন ধর্মগুলোর প্রচারকরাও তানাসুখ তথা পুনর্জন্মের আকীদা ও দর্শনের প্রবক্তা ছিল। এ আকীদা-বিশ্বাস থাকলে মানুষের নিজের ইচ্ছা ও স্বাধীনতার ধারণাই শেষ হয়ে যায়। আর এ কারণেই প্রতিটি মানুষ নিজের অতীত কর্মের সাজা ভোগ করতে বাধ্য হয়ে যায়। কখনো সে হিংস্র পশুতে পরিণত হয় আবার কখনো সে বিচরণকারী পশু বা হীন প্রকৃতির কীটে পরিণত হয়, আবার কখনো সে হতভাগ্য নানা যন্ত্রণার শিকার মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে।

খ্রিস্টবাদ ঘোষণা করেছিল যে, মানুষ জন্মগত ও স্বভাবগতভাবে পাপী। আর ঈসা মসীহ তাদের গুনাহের কাফফারা ও প্রায়শ্চিত্ত। এ বিশ্বাস দুনিয়ার লক্ষ-কোটি সভ্য খ্রিস্টানকে নিজেদের ব্যাপারে কুধারণা ও আল্লাহ্‌র রহমত থেকে হতাশার সাগরে নিমজ্জিত করে দেয়।

হতাশার এমন পরিবেশে মানবতার নবী মুহাম্মদুর রাসূল (সা) পূর্ণ শক্তি ও সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি অতি স্বচ্ছ ফলকের ন্যায়, তাতে কোন কিছুই লেখা হয়নি। এখন তাতে হয় কোন হৃদয়গ্রাহী চিত্র অংকন করা যেতে পারে অথবা তাতে কোন সুন্দর ক্যালিগ্রাফী আঁকা যেতে পারে। মানুষ নিজের জীবনকে নিজের ইচ্ছায় শুরু করতে পারে এবং স্বীয় কৃতকর্মের কারণে প্রতিদান বা শাস্তির, জান্নাত কিংবা জাহান্নামের যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। তাকে অন্য কোন মানুষের জবাবদিহি করতে হবে না।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে যে, মানুষ শুধু নিজের কর্মের যিম্মাদার এবং স্বীয় চেষ্টা-সাধনার ফল পাওয়ার যোগ্য।

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ - وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ - وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ - ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ -

" আর এই যে, কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না; আর এই যে, মানুষ তাই পায়, যা সে চেষ্টা করে। আর এই যে, মানুষের চেষ্টা (কর্ম) অচিরেই দেখান হবে, তারপর তাকে পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে।"

[সূরা আন-নাজম : ৩৮-৪০]

গুনাহ মানব স্বভাবের জন্য সাময়িক ও বহিরাগত, আর কল্যাণকামিতা ও শান্তিপ্রিয়তা প্রকৃতিগত

গুনাহ মানব স্বভাবের জন্য সাময়িক ও বহিরাগত এবং কল্যাণ কামনা ও শান্তিপ্রিয়তা তার প্রকৃতিগত ও অভ্যন্তরীণ বিষয়। এ ঘোষণা মানুষকে তার প্রকৃতির উপর হারানো আস্থা ফিরিয়ে দিয়েছে। ফলে, এখন মানুষ দৃঢ় সংকল্প, উৎসাহ-উদ্দীপনা, সাহস ও বীরত্বের সাথে সামনে অগ্রসর হতে থাকে যাতে সে তার ভাগ্য ও মানবতার ভবিষ্যতকে সুন্দর করতে পারে এবং বিশাল সম্ভাবনাময় ও মূল্যবান মুহূর্তগুলোতে নিজের ভাগ্য ও সক্ষমতার পরীক্ষা করতে পারে।

মুহাম্মাদুর রাসূল (সা) এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন যে, গুনাহ, বিচ্যুতি ও ভুল মানব জীবনের একটি সাময়িক, অস্থায়ী ও খণ্ডকালীন বিষয়। মানুষ নিজের অজ্ঞতা, সরলতা, সংকীর্ণতা, আবার কখনো নফস ও শয়তানের ধোঁকার কারণে এতে পতিত হয়। আর কল্যাণকামিতা, সততা, গুনাহের স্বীকৃতি, তাতে অনুতপ্ত হওয়া তার মূল স্বভাব ও মানব প্রকৃতি। আর আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করা, ক্রন্দন করা ও বিনয়ী হওয়া, গুনাহ না করার সংকল্প করা মানুষের ভদ্রতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রতীক এবং হযরত আদম (আ)-এর মীরাস উত্তরাধিকার।

তাওবার মর্যাদা ও স্থান

এমন গুনাহগার মুসলমান– যারা গুনাহের জলাভূমিতে গলা পর্যন্ত আটকে ও ডুবে রয়েছে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের সামনে তাওবার প্রশস্ত দরজা খুলে দিয়েছেন। অতঃপর সর্বসাধারণকে সেদিকে উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। তিনি তাওবার ফযীলত অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। ফলে, তা সামনে রেখে একথা বলা যায় যে, তিনি ধর্মের এ মহৎ স্তম্ভকে পুনরায় উজ্জীবিত ও সুদৃঢ়

করেছেন। আর এ কারণে প্রিয় নবী (সা)-এর অসংখ্য নামের একটি সম্মানিত নাম 'তাওবার নবী'। প্রিয় নবী (সা) তাওবাকে শুধু একটি অপরিহার্য মাধ্যমই বলেননি, বরং যাদ্বারা মানুষ ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে, তিনি (সা) তাওবার স্থানকে অত্যন্ত উচ্চস্তরে রেখেছেন এবং তাকে অতি উত্তম ইবাদত বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে মানুষ অল্প সময়ের মধ্যেই আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভ ও বিলায়েতের সুউচ্চ স্তরে পৌঁছার সহজ রাস্তা বানিয়ে দিয়েছেন– যা দেখে বড় বড় আবেদ ও দুনিয়াবিমুখ যাহেদ ও ঐ সকল গুনাহমুক্ত পবিত্র আত্মার অধিকারী ব্যক্তিগণ ঈর্ষাবোধ করেন।

পবিত্র কুরআনে তাওবার ফযীলত ও ব্যাপকতা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তাওবার মাধ্যমে মানুষ নিজের কল্পনায় আসা বড় থেকে বড় গুনাহ হতে পাক-পবিত্র হয়ে যেতে পারে। এ বিষয়টি পবিত্র কুরআন অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ব্যক্ত করেছে, অতঃপর পাপী ও অপরাধী, নফস ও শয়তানের কাছে পরাজিত ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে আসার এবং তাঁর স্নেহ ও রহমতের ছায়াতলে প্রবেশ করার সাধারণ দাওয়াত দিয়েছে, তাঁর রহমতের তরঙ্গমালা ও কুলকিনারাহীন সমুদ্রের (যা নফসসমূহ ও দিগন্তসমূহকে ঘিরে রেখেছে) এমন মনোমুগ্ধকর ও উৎসাহব্যঞ্জক চিত্র উপস্থাপন করেছে– যাদ্বারা প্রকাশ পায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা শুধু যে হালীম, রহীম, জাওয়াদ ও কারীমই নন; বরং (যদি একথা বলা সঠিক হয় তাহলে) বলা যায় যে, তিনি তাওবাকারীদেরকে মহব্বত করেন, তাদের প্রতি আগ্রহী থাকেন এবং তাদের মেহনতের পরিপূর্ণ মূল্যায়ন করেন। আপনি নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করুন, ঐ স্নেহ-ভালবাসা, দয়া-মমতার পরিবেশকে অনুভব করুন যা– এ আয়াতের পরতে পরতে বর্ণিত হয়েছে :

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

"আপনি (আমার পক্ষ হতে) ঘোষণা দিন যে, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ, আল্লাহ্‌র রহমত হতে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সকল গুনাহ ক্ষমাকারী। অবশ্যই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা যুমার : ৫৩]

অন্যত্র আল্লাহ্ পাক তাঁর নেককার বান্দাদের বিভিন্ন দলের আলোচনা করেছেন আর এ নূরানী কাফেলার সূত্রপাত করেছেন তাওবাকারীদের দ্বারা। তিনি ইরশাদ করেন :

التَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ-

"ঐ সকল মুজাহিদ, যারা তাওবাকারী, ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, রোযা পালনকারী, রুকূকারী, সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজে বাধা-দানকারী, আল্লাহ্‌র সীমানার হিফাযতকারী আর আপনি মুমিন বান্দাদিগকে সুসংবাদ প্রদান করুন।" [সূরা তাওবা : ১১২]

তাওবাকারীদের সম্মাননা

তাওবাকারীদের সম্মাননা প্রদান ও তাদের গুনাহ মাফ হওয়া ও তার উপর খুশি ও আশা ব্যক্ত করার বিষয়টি ঐ সময় আরো বেশি স্পষ্ট হয়েছে, যখন পবিত্র কুরআন ঐ তিন সাহাবীর তাওবা কবূল হওয়ার ব্যাপারে ঘোষণাদান করেছিল– যারা কোন সঙ্গত ও যৌক্তিক কারণ ছাড়াই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে মদীনাতে থেকে গিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন প্রথমে প্রিয়নবী (সা) ও ঐ সকল মুহাজির ও আনসার সাহাবীর আলোচনা করেছে– যারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর পরপরই ঐ তিন পিছিয়ে পড়া সাহাবীর আলোচনা করেছে যাতে তারা এটা অনুভব না করে যে, শুধু তাদের তাওবা কবূল হয়েছে এবং এ ধাপ অতিক্রম করে পুনরায় অনুগত মুমিনদের কাতারে শামিল হয়েছে বরং তারা যেন অপমানের অনুভূতি ও তার ছায়া হতে দূরে থাকে এবং তাদের মাঝে যেন হীনম্মন্যতার অনুভূতি সৃষ্টি না হয়। এ ঈমান ও ইখলাসওয়ালা জামাতের কাছে (যাদের থেকে একটিমাত্র গুনাহ ঘটেছিল) কিয়ামত পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সত্যবাদী প্রথম স্তরের সাহাবাদের কাতারই তাদের স্বাভাবিক স্তর। এ কারণে তাদের লজ্জা-শরম ও অপমানবোধের কোন কারণ নেই।

অন্য কোন ধর্মে, আখলাক-চরিত্র ইসলাহ ও তরবীয়তের ইতিহাসে তাওবা কবূল হওয়া, তাওবাকারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাদের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা, দয়া ও অনুগ্রহের সাথে তাদের মানসিক অশান্তি দূর করা এ থেকে অধিক উজ্জ্বল, হৃদয়গ্রাহী, সূক্ষ্ম ও গভীর, মনোহর ও মনোমুগ্ধকর দৃষ্টান্ত কি পাওয়া যেতে পারে? আসুন ঐ আয়াতগুলো পুনরায় তিলাওয়াত করুন :

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّه بِهِمْ

رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا أَنْ لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা নবী এবং মুহাজির ও আনসারগণের প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ হলেন যারা সংকটের মুহূর্তে নবীর অনুগত হয়েছিল অথচ সে সময় তাদের একটি দলের অন্তরে কিছুটা অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ওদের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু আর তিনি ক্ষমা করলেন ঐ তিনজনকেও যাদের বিষয়টি মুলতবি রাখা হয়েছিল। এক পর্যায়ে পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল এবং তাদের জন্য তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল। তখন তারা বুঝতে পেরেছিল যে, আল্লাহ্র হাত থেকে রক্ষা পাবার তিনি ছাড়া আর কোন আশ্রয় নেই। তখন তিনি তাদের তাওবা কবূল করলেন যাতে তারা তাওবায় স্থির থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা তাওবা : ১১৭-১১৮]

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একটি সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্র রহমত সকল কিছু থেকে বড় এবং তা তাঁর গযব ও পরাক্রম থেকেও অগ্রগামী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْئٍ "আর আমার রহমত সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত।" [সূরা আ'রাফ : ১৫৬]

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে : إِنَّ رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ عَلٰى غَضَبِيْ "আমার রহমত আমার ক্রোধ থেকে অগ্রগামী।" [মুসলিম]

পবিত্র কুরআন হতাশাকে কুফরী, অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার সমার্থক হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং হযরত ইয়াকূব (আ)-এর ভাষায় তা ব্যক্ত করেছে :

إِنَّهُ لاَ يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ـ

"আল্লাহ্র রহমত থেকে শুধুমাত্র কাফির দলই বিশ্মিত হয়।" [সূরা ইউসুফ : ৮৭]

অন্যত্র হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথা বর্ণনা করা হয়েছে :

وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُّوْنَ ـ

"স্বীয় রবের রহমত থেকে কেবল পথভ্রষ্টরাই বিশ্মিত হয়।" [সূরা হিজর : ৫৬]

মানবতার জন্য রহমত ও সুসংবাদ

এভাবে প্রিয়নবী (সা) তাওবার প্রকাশ্য ও সাধারণ দাওয়াত দিয়েছেন এবং তার ফযীলত ও ব্যাপকতার কথা বর্ণনা করে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষকে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন। কারণ তারা হতাশা-নিরাশার ভারে নূয়ে পড়ে আর্তনাদ করছিল এবং আযাব ও তিরস্কারের ফলে এবং গযব-ক্রোধের বহিঃপ্রকাশে তাদের দিল প্রকম্পিত ছিল। আর তাদের এ অনুভূতি সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ইয়াহূদী পণ্ডিত, কিতাবুল মুকাদ্দাসের ব্যাখ্যাদাতা ও খ্রিস্টান উগ্র ধর্মগুরু ও ধর্মীয় নেতাদের বড় দখল ছিল।

প্রিয় নবী (সা) মানবতা ও মানব জীবনকে একটি নতুন ও সুখকর জীবন দান করেন। তাদের দুর্বল ও নির্জীব হৃদয়ে এবং নিস্তেজ দেহে একটি নতুন প্রাণ ও নব উদ্যমতা সৃষ্টি করেন, তার ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেন এবং যমীনের নিচ থেকে উঠিয়ে সম্মান, সৌভাগ্য, আত্মবিশ্বাস ও আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভশীলতার উচ্চতম শিখরে পৌঁছিয়ে দেন।

দ্বীন ও দুনিয়ার সমন্বয় এবং যুদ্ধমান ও পরস্পর বিরোধী শ্রেণীর ঐক্য

বিভক্ত মানবতা এবং রণক্ষেত্র দুনিয়া

প্রাচীন ধর্মসমূহ, বিশেষ করে খ্রিস্টবাদ মানব জীবনকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রেখেছিল– যার একটি ছিল ধর্মের জন্য, আর অপরটি দুনিয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল। এভাবে ভূ-পৃষ্ঠকেও দু'টি শিবিরে বিভক্ত করে রেখেছিল। একটি শিবির ছিল দ্বীনদার ধার্মিক লোকদের জন্য, আর অপরটি ছিল দুনিয়াদার লোকদের জন্য। এ দুটি শিবির কেবল পৃথকই ছিলো না, বরং তাদের পরস্পরের মাঝে এক উপসাগর অন্তরায় ছিল; উভয়ের মাঝে একটি লৌহপ্রাচীর দাঁড়িয়েছিল এবং উভয়ের মাঝে শক্তি পরীক্ষার পাঞ্জা লড়াই ও রশি টানাটানি লেগেই থাকত। প্রত্যেকের বিশ্বাস ছিল যে, দ্বীন ও দুনিয়ার মাঝে চিরন্তন দুশমনী রয়েছে। তাই যদি কেউ একটির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইত, অন্যটির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, .এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করা তার জন্য জরুরী হয়ে পড়ত। কারণ, তাদের কথা অনুযায়ী একই সময়ে দুই নৌকাতে আরোহণ করা সম্ভব নয় এবং আখিরাত ও বিশ্ব স্রষ্টার প্রতি উদাসীন হওয়া ছাড়া অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা ও সচ্ছলতা অর্জনও সম্ভব নয়। ঠিক তেমনিভাবে, রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসনকার্য ধর্মীয় অনুশাসন, নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা ও আল্লাহ্-ভীতি থেকে পৃথক হয়েই কেবল পরিচালনা করা সম্ভব। অন্যদিকে, বৈরাগ্য এবং দুনিয়া ও তার মাঝে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়া ধর্মীয় জীবন যাপন করা যায় না।

এ দৃষ্টিভঙ্গির স্বাভাবিক পরিণতি

এটি একটি জ্ঞাত ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, মানুষ স্বভাবতই সহজাত প্রিয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই যে ধর্মই বৈধ বস্তু থেকে উপকৃত হওয়া, উন্নতি-অগ্রগতি, মান-সম্মান, শক্তি-সামর্থ্য ও রাজত্ব লাভের অনুমতি দান করে না, তা অধিকাংশ সময় মানব জাতির জন্য উপযোগী হয় না। আর সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির সাথে দ্বন্দ্বও মানুষের স্বাভাবিক চাহিদার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তখন এর স্বাভাবিক পরিণতি এই হয় যে, বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত লোকদের এক বিশাল জনগোষ্ঠী দুনিয়াকে দ্বীনের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে এবং তাকে

সামাজিক প্রয়োজন ও প্রকৃত বাস্তবতা মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে। অতঃপর এ জীবনকে সুসজ্জিত ও তার উন্নতি সাধন করতে এবং তা উপভোগে লেগে যায় আর দ্বীনি ও রূহানী উন্নতিকে উপেক্ষা করে। তাদের অনেকেই যারা ধর্মকে ত্যাগ করেছে, তারা দ্বীন ও দুনিয়ার মাঝে বৈপরীত্য ও দ্বন্দ্বকে স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতা বলে মনে করে। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসন ধর্মের প্রতিনিধিত্বকারী গির্জার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। অতঃপর তারা এর সকল বিধি-বিধান হতে মুক্ত হয়ে গেল। এর ফলে যৌক্তিকভাবেই প্রশাসন ঐ পাগলা হাতির মত হয়ে গেল– যে শিকল ভেঙ্গে ফেলেছে অথবা ঐ উটের মত হলো– যা লাগামহীন হয়ে গিয়েছে। দ্বীন ও দুনিয়ার মাঝে এ নিকৃষ্ট ব্যবধান এবং দ্বীনদার ও দুনিয়াদার লোকদের মাঝে সৃষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত দ্বন্দ্ব-কলহ ও দুশমনির কারণে ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার দরজা খুলে দেয়– যার প্রথম শিকার হয়েছে ইউরোপ। অতঃপর ঐ সকল দেশ– যারা চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইউরোপের অনুসারী অথবা তা দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

এ অবস্থাকে উগ্র খ্রিস্টানেরা আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। কারণ, তারা মানব প্রকৃতিকে আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের পথে বড় প্রতিবন্ধক মনে করত। আর যারা এটাকে পথভ্রষ্ট মনে করত এবং কঠিন বিধি-নিষেধ ও নিয়ার্তন মূলক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তাকে কঠিন শাস্তি দেবার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি করেনি, তারা ধর্মকে অত্যন্ত ভয়ানক ও ঘৃণিত আকৃতিতে উপস্থাপন করেছিল– যার দ্বারা এর অনুসারীদের দেহ-মন প্রকম্পিত হয়।[১]

পরিশেষে, এ কারণে দ্বীনের পরিধি ও প্রভাব সংকুচিত হতে থাকে এবং স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রকৃতি পূজা (ব্যাপক অর্থে) সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়। ফলে, দুনিয়া দু'টি বিপরীতমুখী অবস্থার মাঝে দুলতে থাকে। অতঃপর ধর্মীয় অনুভূতির দুর্বলতার কারণে গোটা বিশ্ব ধর্মহীনতা ও ব্যাপক নৈতিক বিশৃংখলার অতল গহ্বরে পতিত হয়।[২]

ঐক্যবাদী ধর্ম ও তার ব্যাপকতা

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বোত্তম উপহার ও তাঁর বড় অবদান হলো তাঁর ঐ সর্বজনীন ঘোষণা যে, কর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তি জানাই হলো মানুষের অভীষ্ট লক্ষ্য। এটাকেই শরী'আত এক ব্যাপক ও বিস্তারিত অথচ ছোট ও

---

১. লেকী (Lecky) রচিত ইউরোপের নীতি-নৈতিকতার ইতিহাস ,২য় খন্ড

২. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ড্রেপার রচিত : Conflict Between Religon and Science.

অর্থবহ শব্দ 'নিয়ত' দ্বারা প্রকাশ করেছে। ইরশাদ হচ্ছে :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى۔

"নিয়তের উপরই সমস্ত কাজের ফলাফল নির্ভর করে। আর মানুষ যা নিয়ত করবে, তারই ফল সে লাভ করবে।" [বুখারী]

মানুষের সকল কাজের উদ্দেশ্যই যদি ইখলাসের সাথে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর হুকুম পালন হয়ে থাকে, তাহলে তার ঐ সকল কর্ম তাকে পৌঁছে দেবে আল্লাহ্‌র কাছে, ইয়াকীন ও বিশ্বাসের সুউচ্চ চূড়ায়। আর এটাই হলো সেই খালেস দ্বীন যাতে পার্থিব মলিনতার ন্যূনতম ছোঁয়াও থাকবে না। এটি সব ধরনের কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হোক না তা জিহাদ ও লড়াই, হোক না তা দেশ শাসন ও রাষ্ট্র পরিচালনা, হোক না তা দুনিয়ার বৈধ বস্তুসমূহ হতে খিদমত গ্রহণ, হোক না তা মনের চাহিদা পূরণ কিংবা জীবিকার তাগিদে চাকরি খোঁজার চেষ্টা-তদবীর, কিংবা জায়েয ও বৈধ আনন্দ বিনোদন, দাম্পত্য জীবনের সুখ-সম্ভোগের বিষয় অথবা সকল প্রকার ইবাদত ও দ্বীনি খিদমত।

পক্ষান্তরে, এ সকল বিষয় যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর হুকুম পালনের নিয়তে না হয়, তাহলে তা দুনিয়াবী কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে, তার উদ্দেশ্য তখন গায়রুল্লাহ হবে এবং তার উপর গাফলতি ও আখিরাত বিস্মৃতির আবরণ পড়ে যাবে। এ অবস্থায় ফরয নামাযসমূহ, হিজরত ও জিহাদ, যিকির ও তাসবীহ-এর মত ইবাদতগুলোও দুনিয়াবী বলে গণ্য হবে এবং এগুলোর আমলকারী ব্যক্তি, আলিম, মুজাহিদ ও ধর্মপ্রচারক সকলের জন্য সওয়াবের পরিবর্তে শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ফলে, এগুলো তার ও তার রবের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

খ্রিস্টীয় ইউরোপে দ্বীন ও দুনিয়া এবং রাজা ও গির্জার দ্বন্দ্ব

মধ্যযুগে খ্রিস্টান বিশ্ব এক রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। এর এক পক্ষে ছিল গির্জা– যারা ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করত এবং তাদের ভিত্তি ছিল বৈরাগ্যবাদের ওপর। আর অপরপক্ষ ছিল রাষ্ট্র– যা ছিল খ্যাতি ও সম্মানের মাধ্যম ও প্রকাশস্থল। তাদের উভয়ের মাঝে প্রবল রশি টানাটানি হচ্ছিল। ফলে, ধর্ম ও রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত পৃথক পৃথক হয়ে গেল। আর এর পরিণতি সকলের জানা আছে; দুনিয়া তার শাস্তি এখনো ভোগ করছে এবং এ পথে হোঁচট খাচ্ছে।

আল্লামা ইকবাল ঐ ঐতিহাসিক বাস্তবতার অত্যন্ত স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর 'ধর্ম ও রাষ্ট্র' নামক চিন্তাশীল কাব্যে উল্লেখ করেন :

کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی، سماتی کہاں اس فقیری میں میری
خصومت تھی سلکانی دراہی میں، کہ وہ سر بلندی ہے یہ بزیری
سیاست نے مذہب سے پیچا چھڑایا، چلی کچھ نہ پیر کلیسا کی پیری
ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری
دوئی ملک و دیں کے لئے نامرادی، دوئی چشم تہذیب کی نابصیری
یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشیں کا، بشیری ہے آئینہ دار نذیری
اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی
کہ ہوں ایک جنیدی و اردشیری

'গীর্জার ভিত্তি ছিল বৈরাগ্যের উপর। এই দারিদ্র্যের মাঝে আমার স্থান হত কোথায়।

দ্বন্দ্ব চলছিল রাজত্ব ও পৌরোহিত্যের মাঝে। যে এটাই রাজনীতি মর্যাদা, ওটা নীচুতা।

ধর্মের অনুসরণ থেকে মুক্তি পেয়েছে রাজনীতি। গীর্জার পাদ্রীদের কর্তৃত্ব আর চললো না।

যখন থেকেই রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়েছে তখন থেকে হয়েছে লালসার রাজত্ব, লালসার মন্ত্রিত্ব।

বিভেদ রাষ্ট্র ও দ্বীনের ব্যর্থতা, বিভেদ সভ্যতার চোখের জন্য অন্ধত্ব।

এক মরুবাসীর জন্য এটা একটা অলৌকিকত্ব যে, মানবতাই সতর্ককারিতার বৈশিষ্ট্য।

এরই মধ্যে রয়েছে মানবতার রক্ষা যে, আমি হলাম একজন জুনায়দী ও আর্দশেরী।' [বাবে জিবরীল]

বিচ্ছেদের পরিবর্তে মিলন

সাইয়েদিনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চিরন্তন অবদান ও অনুগ্রহের অন্যতম হলো এই যে, তিনি দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যকার এ বিশাল ব্যবধানকে ঘুচিয়ে দিয়েছেন এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও শত্রুভাবাপন্ন এ দল দু'টিকে অবিরাম হিংসা-হানাহানি ও জীঘাংসা থেকে মুক্ত করে গলায় গলায় মিলিয়ে দিয়েছেন, বেঁধে দিয়েছেন ভালবাসা ও সম্প্রীতির এক সুগভীর দৃঢ় বাঁধনে, উপহার দিয়েছেন ঐক্য ও নিরাপত্তার এক নতুন পৃথিবী, শিক্ষা দিয়েছেন মিলেমিশে বাস করার পদ্ধতি। প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূল (সা) তাঁর এ অবদানের আলোকে তিনি ঐক্যের নবী। আবার একই সাথে তিনি 'বাশীর' ও 'নাযীর'– সুসংবাদ- দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে পরিলক্ষিত হন। কারণ, তিনি মানব জাতিকে দু'টি যুদ্ধশিবির থেকে মুক্ত করে ঈমান ও ইহতেসাব, মানব সেবা ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনকারী শিবিরে পরিণত করেছেন এবং আমাদেরকে সার্বজনীন, মুজিযাপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ শিক্ষাদান করেছেন :

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করুন এবং পরকালের কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে আগুনের 'আযাব' হতে রক্ষা করুন।"

[সূরা বাকারা - ১২০]

তিনি আরো ঘোষণা করেছেন :

اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

"নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু কেবল জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যেই নিবেদিত।"

গোটা জীবনই ইবাদত আর সমগ্র বিশ্ব হলো ইবাদতের স্থান

মুমিনের জীবন কিছু বিচ্ছিন্ন ও বিপরীতমুখী এককের যোগফল নয়; বরং তা হলো এমন এক পূর্ণ ঐক্যের নাম যেখানে ইবাদত ও জবাবদিহিতার রূহ ও অনুভূতি কার্যকর থাকে। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও তাঁর আনুগত্যের প্রেরণা তাকে পরিচালিত করে। এ অনুভূতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং চেষ্টা-সাধনা ও কর্মব্যস্ততার সকল স্থান ও সকল ক্ষেত্রকে তার আওতাভুক্ত করে। তবে শর্ত হলো, তা হতে হবে ইখলাস ও খাঁটি নিয়তে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নবীগণের দিকনিদের্শনা অনুযায়ী।

একথা ঐ বাস্তবতাকে আরো সুস্পষ্ট করে যে, প্রিয় নবী (সা) হলেন পূর্ণ ঐক্য ও পরিপূর্ণ একতার রাসূল। একই সাথে তিনি মানবতাকে ভাল কাজের উপর সুন্দর ভবিষ্যতের সুসংবাদ প্রদানকারী এবং আল্লাহ্‌র 'আযাব থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও সতর্ককারী। প্রিয় নবী (সা) দ্বীন-দুনিয়ার বিভাজন নীতিকে ভুল সাব্যস্ত করে গোটা জীবনকে ইবাদত ও গোটা বিশ্বকে মসজিদ তথা সিজদার স্থানরূপে ঘোষণা করেছেন এবং বিশ্ব মানবতাকে সংঘাতময় ও সাংঘর্ষিক শিবির থেকে মুক্ত করে সৎকর্মপরায়ণ, মানবতার খিদমত, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির এক বিশাল, বিস্তৃত ও ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্মে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এখানে বাদশাহকে আপনি দরবেশের ছিন্ন বস্ত্রে এবং আবেদ ও দুনিয়াবিমুখ দরবেশকে রাজা-বাদশাহদের পোশাকে দেখতে পাবেন। তারা ধর্ম ও সহনশীলতায় পর্বততুল্য, ইলম ও হিকমতের উৎস, রাতের ইবাদতকারী আর দিনের অশ্বারোহী; এরপরেও তাদের ব্যক্তিত্বের মাঝে কোন বৈপরীত্য ও ভারসাম্যহীনতা দেখা যাবে না।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের সংশ্লিষ্ঠতা এবং এক পবিত্র ও স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন এবং একের সাথে অন্যের সম্পর্ক জুড়ে দেওয়া

পবিত্র স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চিরন্তন অনুগ্রহরাজী ও তাঁর নবুয়ত ও দাওয়াতের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে একটি পবিত্র ও চিরন্তন সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। একটির ভবিষ্যত ও পরিণতি অন্যটির ভবিষ্যত ও পরিণতির সাথে জুড়ে দিয়েছেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন এবং তা অর্জনের জন্য অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করেছেন– যার দরুন এ ব্যাপারে নতুন কিছু সংযোজন করা সম্ভব নয়। আর এ কারণে তার স্বাভাবিক প্রতিফলন ঘটেছে এভাবে যে, ইসলামের ইতিহাসে এমন সব গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা হয়েছে– যা সাধারণত ধর্ম ও আসমানী গ্রন্থের দাবিদার সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অপরাপর সময়কালেও তা বিরল।

এর একটি বড় প্রমান এই যে, প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা)-এর উপর নাযিলকৃত প্রথম অহীতে বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা বিশ্বমানবতাকে জ্ঞান দান করে যে দয়া করেছেন, তার আলোচনা রয়েছে। তিনি এ ক্ষেত্রে কলমের বড় অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করেন। কারণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক সফরের সূত্রপাত এর সাথে সম্পৃক্ত। এ কলমের মাধ্যমে চালু হয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা ও গবেষণার বিশ্বব্যাপী আন্দোলন, যার মাধ্যমে আজ পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান একজন থেকে অপরজনের কাছে, এক জাতি থেকে অপর জাতির কাছে, এক যুগ থেকে অন্য যুগে, এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্মে পৌঁছে যাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার ঘটার ক্ষেত্রে এবং তা মানবীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হওয়ার ক্ষেত্রে এরই ব্যাপক ও গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে; আজকের স্কুল-কলেজ-মাদরাসা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রসমূহ কলমকে কেন্দ্র করেই কর্মমুখর হয়ে রয়েছে।

প্রথম অহীতে কলমের আলোচনা করার মত কোন মানবীয় শর্ত ও যৌক্তিক বিচার-বিবেচনা ছিল না। আবার প্রথম ওহীতে কলমের আলোচনা আনার মত এমন কোন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও তৈরি হয়নি। কারণ অহী তো নাযিল হয়েছিল একজন উম্মী নবীর প্রতি এবং এক মূর্খ জাতির মাঝে, একটি অনুন্নত

এলাকাতে। এ অঞ্চলে কলম নামের বস্তুটি ছিল সর্বাপেক্ষা দুর্লভ বস্তু। আর এ কারণে আরবজাতিকে উম্মী জাতি বলা হত। পবিত্র কুরআনে তাদের এ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ আছে। ইরশাদ হয়েছে :

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْأُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ-

"তিনিই ঐ মহান সত্তা যিনি উম্মী লোকদের মাঝে তাদের মধ্য হতে একজনকে রাসূল করে প্রেরণ করেছেন। (এজন্য যে,) তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াত পড়ে শোনাবেন, তাদের আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটাবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন। বস্তুত তারা ছিল সুস্পষ্ট গোমরাহীতে।"

[সূরা জুমু'আ : ২]

আরবদের উম্মী হবার ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ইয়াহূদীদের কথাকে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছে। কারণ, তারা মদীনাতে আরবদের প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করত। ফলে, তারা আরবদের সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত ছিল। ইরশাদ হচ্ছে :

لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْأُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ-

"আমাদের উপর উম্মীদের (মূর্খদের) ব্যাপারে কোন দায়-দায়িত্ব নেই।"

[আলে ইমরান : ৭৫]

এ উম্মতের মাঝে যে রাসুল (যাঁর কাছে অহী নাযিল হচ্ছিল) তিনিও পূর্ণ উম্মী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِىْٓ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

"এভাবেই আমরা আপনার কাছে অহী অর্থাৎ আমার নির্দেশসমূহ প্রেরণ করেছি। আপনার তো খবরই ছিল না কিতাব কি জিনিস আর না আপনি ঈমান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তবে আমি এ কুরআনকে নূর হিসেবে প্রেরণ করেছি যাতে এর মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করি। আর নিঃসন্দেহে আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন।" [সূরা শূরা : ৫২]

অন্যত্র ইরশাদ করেন :

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِه مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّه بِيَمِيْنِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ-

"আর আপনি এ কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেন নি। আর আপনার হাত তা (অর্থাৎ কোন কিতাব) লেখেনি। অন্যথায় তো বাতিলপন্থীরা সন্দেহ পোষণ করত।" [সূরা আনকাবূত : ৪৮]

এক অনাকাঙ্ক্ষিত সূচনা

হেরা গুহায় সর্বপ্রথম উম্মী নবী (সা)-এর প্রতি এ অহীটিই নাযিল হয়। (অথচ এটি ছিল ছয়শত বছরের[১] এ দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতার পর পৃথিবীর সাথে আসমানের এবং আসমানের সাথে পৃথিবীর সম্পর্ক অহীর মাধ্যমে গড়ে ওঠা অথচ তাতে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীর হুকুম, আল্লাহ্‌র পরিচয় ও আনুগত্য সংক্রান্ত আদেশ কিংবা তাতে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ, জাহিলিয়্যত ও তার রীতি-নীতি পরিত্যাগ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়নি। যদি এমন আদেশ-নিষেধ থাকত, তাহলে তা যথার্থই হত। কারণ, তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এবং যথাস্থানে তার সুস্পষ্ট তাবলীগ করা হত। কিন্তু তা না হয়ে অহীর সূত্রপাত হয়েছে اقرأ শব্দদ্বারা। ইরশাদ হচ্ছে :

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ -

"পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন (সকলকে)। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্ত হতে। আপনি পড়ুন, আর আপনার রব বড়ই দয়ালু– যিনি শিক্ষা দেন কলমের মাধ্যমে। তিনি মানুষকে শিক্ষাদান করেছেন যা সে জানত না।" [সূরা 'আলাক : ১-৫]

এভাবেই এ ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্রপাত হয়। এ ঘটনা ইতিহাসবিদ ও চিন্তাবিদগণের সামনে চিন্তা-ভাবনার এক নতুন ও প্রশস্ত জগৎ উন্মোচন করে দেয়। আর এটা ছিল এ বাস্তবতার প্রতি সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট ইঙ্গিত যে, একজন উম্মী নবী (সা)-এর মাধ্যমে মানব সভ্যতা ও ধর্মীয় ইতিহাসের একটি নতুন যুগের

১. এ দীর্ঘ সময় ঈসা (আ) ও আমাদের নবী (সা)-এর মধ্যবর্তীকালে অতিক্রান্ত হয়েছিল

সূত্রপাত হতে যাচ্ছে, তা ব্যাপক ও গভীর অর্থে লেখাপড়ার বিস্তৃতি ও উন্নত যুগ হবে এবং সে যুগে লেখাপড়ার রাজত্ব চলবে। তারা তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দ্বীন-ধর্মের সম্মিলিতভাবে একটি নতুন মানব সমাজ ও একটি নতুন বিশ্ব গঠন করবে এবং তার উৎকর্ষ সাধন করবে।

আর এটা তখনই সম্ভব হবে যদি লেখাপড়ার সূচনা হয় নবুয়তের ছত্র-ছায়ায় এবং ঐ মালিকের নামে (যিনি এ বিশ্বজগৎ ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন) যাতে এ জ্ঞান-বিজ্ঞান আল্লাহ্‌র প্রতি ইয়াকীন ও তাঁর সঠিক মা'রেফাতের রঙে রঙিন হয় এবং তার আলোকরশ্মি ও দিকনির্দেশনায় আপন সফর চালু রাখতে পারে। আর এজন্য ইরশাদ করেন :

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ۔

"পড়ুন! আপনার রবের নামে যিনি (বিশ্বজগৎ) সৃজন করেছেন।"

সেই সাথে মানুষ যেন নিজের স্বরূপ ও সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে অবহিত থাকে যাতে সে কখনো নিজের সত্তাকে ভুলে না যায় এবং সীমা অতিক্রম না করে ও জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কারিগরি ও সৃষ্টিজগৎকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে নিজেদের সফলতায় যেন ধোঁকা না খায়। এজন্য ইরশাদ করেন :

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ۔

"যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্ত হতে।"

এপর তিনি কলমের মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন এবং তার সম্মান ও মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান, লেখাপড়া, শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে তার অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন– যা মক্কা তথা আরব উপদ্বীপে জানা সম্ভব ছিল না। কারণ, সেখানে তা অল্প কিছু মানুষের কাছেই ছিল মাত্র। আর এ কারণে আরব উপদ্বীপে লেখাপড়া জানা লোককে কাতেব বা লেখক বলা হতো। তাই এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ۔

"যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন।"

অতঃপর মানুষের ঐ যোগ্যতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ দ্বীন ও দুনিয়া সম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-গবেষণা ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন জ্ঞান অর্জন করতে এবং তারা তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে সক্ষম। কিন্তু এ সব কিছুর উৎস ও কেন্দ্রই হলো আল্লাহ্‌ প্রদত্ত শিক্ষাব্যবস্থা। আর মানুষকে

বৈশিষ্ট্যসহ সৃষ্টি করা হয়েছে এজন্যে যে, সে অজানাকে জানতে এবং অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্ব প্রদান করতে সক্ষম। আর এজন্যই ইরশাদ হয়েছে :

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ۔

"যিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন এমন সব বিষয়, যা সে জানতো না।"[১]

দ্বীনের মেজায নির্ধারণ

এটি ছিল প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ প্রথম অহী এবং অহীর ধারাবাহিকতার সূচনাবিন্দু– যা পরবর্তী সকল স্তরে এবং দ্বীনের মেজায, স্বভাব ও প্রকৃতি নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং তা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কলা, দাওয়াত ও আন্দোলন বা চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। আর এ কারণে ইসলাম ধর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাঝে স্থায়ী সুসম্পর্ক ও সহযাত্রা রয়েছে। ফলে, ইসলাম সব সময় জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে মানবীয় স্পৃহা ও নতুন নতুন সংকট সমাধান করার যোগ্যতা ও সমর্থনের সঙ্গ দিয়েছে, সাধারণত কোন প্রজন্ম, মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধি ও সুস্থ সমাজ এর মুখোমুখি হয়ে থাকে। ইসলাম কখনোই জ্ঞানের প্রতি বিরাগ বা বুদ্ধিবৃত্তির প্রবাহ-প্রতিপত্তির কারণে ভীত হয়নি।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপারে কিছু ধর্ম ভীত

কিছু ধর্ম এমনো রয়েছে যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৃত্যুর মাঝে নিজেদের জীবন এবং তার পরাজয়ের মাঝে নিজেদের বিজয় অনুভব করে। এর দৃষ্টান্ত একটি গল্পের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়।

কথিত আছে যে, একবার মাছিদের একটি দল হযরত সুলায়মান (আ)-এর কাছে জড়ো হয়ে বাতাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, বাতাস আমাদের উপর নির্দয়ভাবে জুলুম করে। কারণ, আমরা তার উপস্থিতিতে টিকতে পারি না। দমকা বাতাস প্রবাহিত হবার সাথে সাথে আমাদের পলায়ন করতে হয়। তাদের অভিযোগ শ্রবণ করে হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, বিবাদীর উপস্থিতি প্রয়োজন। সুতরাং বাতাসকে তলব করা হলো। কিন্তু বাতাস উপস্থিত হবার

---

১. কুরায়শদের মাঝে মাত্র সতেরজন লেখাপড়া জানত। এটাই প্রসিদ্ধ আরব লেখক ইবন আবদ রাব্বিহী তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল ইকদুল ফারীদ'-এ উল্লেখ করেছেন। (দেখুন– ৪/২৪২ পৃঃ) অধিকন্তু, আল্লামা বালাযুরী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফুতুহুল বুলদান'-এ এ মতই প্রকাশ করেছেন। (দেখুন ৪৫৭ পৃঃ অবশ্য কেউ কেউ এ সংখ্যা কিছু অধিক বলেছেন; তবে তাও খুব বেশি নয়

সাথে সাথে মাছির দল উধাও হয়ে গেল। এতে হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন– বাদীর অনুপস্থিতিতে আমরা কিভাবে সিদ্ধান্ত নিব? এ অবস্থাই অনেক ধর্মের। ভারতের সনাতন ধর্ম এবং তার অসংখ্য নেতার কর্মপদ্ধতিও এ মর্মে একাধিক সাক্ষ্য সরবরাহ করে।

ইউরোপে গির্জা ও বিজ্ঞানের লড়াই ও বিবাদের কাহিনী তো অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে মার্কিন লেখক ড্রেপারের গ্রন্থটি Conflict between Religon and Science ঐতিহাসিক দলিলপত্র সমৃদ্ধ অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ।[১] মধ্যযুগে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত তদন্ত আদালত Courts of Inquistion ও গির্জার মাঝে বিবাদের সংখ্যা হাজারের বেশি হবে। সে সময় ঐসব আদালতের দেয়া লোমহর্ষক রায়ের কারণে আজো শরীর ভয়ে প্রকম্পিত হয়।

খ্রিস্টীয় বিশ্বাসসমূহ পরীক্ষার এ ধর্মীয় আদালতসমূহ (Courts of nquisition) রোমান ক্যাথলিক গির্জার পক্ষ হতে মধ্যযুগে ইতালী, ফ্রান্স, জার্মান ও স্পেনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এ সব আদালত ধর্মত্যাগের কারণে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের নির্মম শাস্তি দেবার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ছিল। ১৪৯০ সালে স্পেনে আরবদের পতনের পর ঐসব আদালতের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সরকার নিজের দখলে নিয়ে নেয়। ফলে, সতের শতাব্দীর দিকে তাদের পতন শুরু হয়। ১৮০৮ সালের দিকে নেপোলিয়ন এগুলো পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৮২০ সালে তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত তা কোনো না কোনো আকারে চলতে থাকে। তবে এটা বলা মুশকিল যে, মোট কত লোক ঐ সকল আদালতের রায়ে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলেছে। তবে এমন লোকের সংখ্যা লাখের মত হবে এটা নিশ্চিত।

পবিত্র কুরআন নাযিল হয়ে শিক্ষার এমন মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করেছে এবং জ্ঞানীদের এত অধিক মর্যাদা ও মূল্যায়ন করেছে– যার তুলনা পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থে এবং প্রাচীন কোন ধর্মে পাওয়া মুশকিল। পবিত্র কুরআন জ্ঞান ও জ্ঞানীদের এমন ভূয়সী প্রশংসা করেছে যাদ্বারা তাদের মর্যাদা নবীদের নীচের স্তরে এবং সকল মানব সম্প্রদায়ের উপরের স্তরে পৌঁছে গেছে। এ মর্মে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন :

---

১. দ্রষ্টব্য, ড্রেপার রচিত 'ধর্ম-ও বিজ্ঞানের যুদ্ধ'। অনুবাদ (উর্দু) লাহোরস্থ 'যমীনদার' পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা জাফর আলী খান বি, এ, (আলীগড়)

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔

"আল্লাহ্ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং ফেরেশতা ও জ্ঞানীগণও আর তিনি ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা।" [সূরা আলে ইমরান : ১৮]

তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেন :

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا۔

"বলুন! হে আমার রব, আমার জ্ঞানকে বাড়িয়ে দিন।" [সূরা তাহা : ১১৪]

قُلْ هَلْ يَسْتَوِيْ الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ۔

"আপনি বলুন, যারা জ্ঞান রাখে আর যারা জ্ঞান রাখে না, তারা কি সমান হতে পারে?" [সূরা যুমার : ৯]

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوْ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমানদার ও জ্ঞানী, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।" [সূরা মুজাদালাহ : ১১]

اِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰوءُا۔

"আল্লাহ্কে তো শুধুমাত্র জ্ঞানী লোকেরাই ভয় করে।" [সূরা ফাতির : ২৮]

এ প্রসঙ্গে প্রিয়নবী (সা)-এর হাদীস ভাণ্ডার হতে এখানে কয়েকটি বর্ণনা করা যথেষ্ট হবে।

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلَى اَدْنَاكُمْ۔

"একজন আলিমের মর্যাদা একজন আবেদের উপর এমন, যেমন তোমাদের সাধারণ মানুষের উপর আমার মর্যাদা।" [তিরমিযী]

إِنَّ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَاِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ۔

"আলিমগণ নবীদের ওয়ারিস, আর নবীগণ কাউকে দীনার বা দিরহামের ওয়ারিস বানান না। তাঁরা শুধুমাত্র এক্ষেত্রে ইলমের ওয়ারিস বানান। সুতরাং যে ইলমকে গ্রহণ করলো, সে বড় মূল্যবান সম্পদ গ্রহণ করলো।"

[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

জ্ঞানের এ পরিমাণ মর্যাদা ও উৎসাহ প্রদানের কারণে ইসলামের ইতিহাসে জ্ঞানের প্রতি এমন উদ্যম, এমন স্পৃহা ও অধ্যবসায় সৃষ্টি হয়েছিল এবং জ্ঞানের জন্য আত্মোৎসর্গ-আত্মবিসর্জনের এমন অপরিসীম আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছিল– যার ফলে বিশ্বব্যাপী চিরন্তন শিক্ষা বিপ্লব সাধিত হয়েছিল এবং তা সর্বাধিক সময়ের ও স্থানের দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। আর এর তাৎপর্যগত দূরত্ব তো পূর্বের দুটো হতে অধিক।[১]

প্রখ্যাত ফরাসী লেখক ড. ল্যাবান তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আরব সংস্কৃতি'তে (তামাদ্দুনে আরব) উল্লেখ করেন :

"আরবগণ জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে যে সাধনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে, তা বাস্তবেই বিস্ময়কর ব্যাপার। এ বিশেষ ব্যাপারে অনেক জাতি-গোষ্ঠী তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করেছে কিন্তু খুব কমই তাদের উপর বিজয়ী হতে পেরেছে। যখনই তারা কোনো শহর গড়ে তুলেছে, তখনই তারা সর্বপ্রথম সেখানে মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছে। বড় বড় শহরে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদরাসা) অধিক পরিমাণে হতো।

বেনজামিন দিলি তওয়িল (মৃঃ ১১৭৩ খ্রিঃ) বর্ণনা করেন, তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় বিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখেছেন।

সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বাগদাদ, কায়রো, টলেডো, কর্ডোভা ও অন্যান্য বড় বড় শহরে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এগুলোতে গবেষণাগার, তথ্যভাণ্ডার, বিশাল গ্রন্থাগার ছিল। মোটকথা, সেখানে গবেষণার সব ধরনের উপকরণ বিদ্যমান ছিল। শুধু স্পেনেই ছিল সত্তরটির মত সাধারণ গ্রন্থাগার।

আরব ঐতিহাসিকগণের বর্ণনামতে কর্ডোভার দ্বিতীয় বাদশাহর কর্ডোভাস্থ গ্রন্থাগারে ছয় লাখ গ্রন্থ ছিল। এর মধ্যে শুধু পুস্তক তালিকা ছিল চল্লিশ খন্ড। এ ব্যাপারে কেউ অত্যন্ত সুন্দর বলেছেন : চারশ বছর পর যখন চার্লস আকেল

---

১. এর বিস্তৃতি ও তার শাখাসমূহ জানার জন্য ঐ সকল গ্রন্থের সাহায্য নেয়া যেতে পারে– যা বিভিন্ন ভাষায় ইসলামি পণ্ডিতগণ রচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, এখানে কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো : ক. আল ফিহরিস্ত, লেখক ইবনু নাদীম, খ. কাশফুযযুনুন, লেখক হাজী খলীফাহ গ. মু'জামুল মুসান্নিফীন, লেখক আল্লামা মাহমূদ হাসান টুংকী (এটি ৬০ খণ্ডে সমাপ্ত এবং ২০,০০০ পৃষ্ঠায় ৪০,০০০ লেখকের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করা হয়েছে); ঘ. আছ-ছাকাফাতুল হিন্দিয়া, লেখক মাওঃ সৈয়দ আব্দুল হাই হাসানী (র.) (দামেশক হতে প্রকাশিত); আরবী সাহিত্যের ইতিহাস লেখক ব্রোকালমান ও 'তারিখুত তুরাছিল আরবী', লেখক ফুয়াদ সাযগীন ইত্যাদি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ

ফ্রান্সের রাজকীয় গ্রন্থাগার নির্মাণ করেন, তখন তিনি ৯০০-এর বেশি গ্রন্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হননি। আর সেখানে পুরো এক আলমারী ধর্মগ্রন্থও ছিল না।[১]

জ্ঞানের বিক্ষিপ্ত পুথিগুলোকে এক সুতোয় বাঁধা

জ্ঞানের সঠিক উদ্দেশ্যের দিকে পথ প্রদর্শন করা এবং তাকে ইতিবাচক, গঠনমূলক ও কল্যাণকর, আরো বিশ্বাসের মাধ্যম বানাবার ক্ষেত্রে প্রিয়নবী (সা)-এর নবুয়ত ও ইসলামি দাওয়াতের ভূমিকা মূল্য ও মূল্যায়নে তা থেকে অনেক বেশি– যা পালন করেছে শিক্ষা আন্দোলনকে কার্যকর করতে ও বিস্তারের ক্ষেত্রে।

জ্ঞানের পুথিগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে ছিল; এবং অনেক সময় পরস্পর সাংঘর্ষিক ছিল। রসায়ণশাস্ত্র ও বিজ্ঞানশাস্ত্র রীতিমত ধর্মের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। এমনকি গণিতশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্রের মতো নির্দোষ জ্ঞানের পণ্ডিতগণও কখনো কখনো নেতিবাচক ও ধর্মহীন নাস্তিক্যবাদী ফলাফল উদ্ভাবন করত। সুতরাং গ্রীক দার্শনিকগণ (যারা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত দর্শন ও গণিতশাস্ত্রে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল) হয়তো তারা মুশরিক ছিল নতুবা তারা ধর্মহীন নাস্তিক ছিল। আর গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বীনি চেতনার জন্য বিপদের কারণ এবং নাস্তিকদের জন্য সনদ ও দলিল-প্রমাণ এবং আদর্শ হয়ে বিদ্যমান ছিল। এ অবস্থায় ইসলামের বড় অবদান ছিল এই যে, তা এমন ঐক্য সৃষ্টি করেছে– যা জ্ঞানের সকল পথিককে এক সুঁতোয় গেঁথেছে। আর এটা তার জন্য করা এজন্য সহজ হয়েছিল যে, তার শিক্ষা সফর সঠিক সূচনাবিন্দু (Staring point) হতে সূত্রপাত হয়েছিল।

ইসলাম শিক্ষাকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান, আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার মাধ্যমে এবং اقرأ باسم ربك এ নির্দেশের উপর আমল করার মাধ্যমে শুরু করে। আর এটা বাস্তব সত্য কথা যে, অনেক সময় সঠিক সূচনা নির্ভুল পরিণাম ও শুভ ফলের নিশ্চয়তা প্রদান করে। ইসলাম কুরআন ও ঈমানের দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে এমন ঐক্য আবিষ্কার করেছে, যা সকল ঐক্যকে এক সুতোয় গেঁথে দেয়। আর এ ঐক্য হলো আল্লাহ্ তা'আলার মা'রিফাত ও পরিচয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাদের প্রশংসা করেছেন :

---

১. আরব সভ্যতা, উর্দূ তরজমা সৈয়দ আলী বিলগিরামী, পৃঃ ৩৯৮-৯৯

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

"তারা আকাশমণ্ডলী ও যমীনের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। অতঃপর বলে– হে আমাদের রব! আপনি এটি অহেতুক সৃষ্টি করেননি। আপনি পবিত্র। আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।"

[আলে ইমরান : ১৯১]

অতীতকালে মানুষের কাছে জাগতিক ঐক্যসমূহের মাঝে বাহ্যত পরস্পর বিরোধী মনে হত। অর্থাৎ জগতের বাহ্যিক কাঠামো, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাঝে সংঘাতময় দৃষ্টিগোচর হত। ফলে, তাকে বিস্ময় ও অস্থিরতার মাঝে ফেলে দিত এবং এক পর্যায়ে তাকে কুফরী ও ধর্মহীনতার পথে নিয়ে যেত। আবার কখনো তা বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বনিয়ন্ত্রকের প্রতি সমালোচনা ও আপত্তির পর্যায়ে পৌঁছে দিত। এসব লক্ষ্য করে কুরআন ও ঈমানভিত্তিক ইসলামি শিক্ষা পৃথিবীকে এমন ঐক্য প্রদান করল– যা জাগতিক ঐক্যসমূহকে একত্রিত করে দিল। আর এটি ছিল আল্লাহ্‌র প্রবল ইচ্ছা ও তাঁর পূর্ণ হিকমতের বহিঃপ্রকাশ।

একজন জার্মান মনীষী হেরাল্ড হফডিং (Harald Hoffding) এ ঐক্যের আবিষ্কার এবং মানব জীবন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নীতি-নৈতিকতার ঐতিহাসিক অভিযাত্রায় তার প্রভাব ও কার্যকর ভূমিকার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন :

"প্রত্যেক ধর্মের বিশ্বাস একত্ববাদের উপর– যার দৃষ্টিভঙ্গি হলো– বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিলাভের কারণ একই (এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অনিবার্য কারণবশত এ ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে) এ দৃষ্টিভঙ্গি ঈমান, আকীদা-বিশ্বাস ও মানব স্বভাবের উপর অত্যন্ত অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে এবং তাকে মান্যকারীদের জন্য এ আকীদা-বিশ্বাস রাখা অত্যন্ত সহজ (কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে মতবিরোধ ও কিছু বিষয়কে এড়িয়ে গেলে) হয় যে, বিশ্বের সবকিছুই একটি বিধিগত নিয়মের আওতায় ঐক্যবদ্ধ। কেননা, কারণের ঐক্য বিধিগত ঐক্যেরও দাবি রাখে।

মধ্যযুগের ধর্মদর্শন আধিক্যের মাঝে ঐক্যের ধারণার বিষয়টি মানুষের মস্তিষ্কে বসিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল, যে কারণে বর্বর লোকেরা প্রকৃতির দৃশ্যমান আধিক্যের কারণে তা থেকে গাফিল ও উদাসীন হয়ে পড়েছিল। আর এ সকল

আধিক্য প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে এজন্য ভুলত্রুটি হত যে, তার হাতে সেগুলোর মাঝে সত্তাগত সম্পর্ক গড়ে তোলার মত কোন সূত্র ছিল না।"[১]

এভাবে জ্ঞান উদ্দেশ্যপূর্ণ, কল্যাণকর, আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। আর তা নিজস্ব প্রচেষ্টায় মানবতার সেবায়, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থার কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করে। ফলে, এ চিন্তাধারা মানুষের চিন্তা-চেতনা ও কর্মপন্থার জগতে সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ বলে বিবেচিত হয়েছিল– যা মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন সাধন করে এবং মানুষের চিন্তার গতি ঘুরিয়ে দেয়। পশ্চিমা মনীষীগণও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানবীয় চিন্তার উপর পবিত্র কুরআনের এ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা তন্মধ্য থেকে এখানে দু'টিমাত্র সাক্ষ্য উল্লেখ করাকে যথেষ্ট মনে করব।

বিখ্যাত ইসলাম বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদ মার্গোলিয়াথ (G. Margolioth), রাডওয়েল (J.M. Rodweil) রচিত কুরআনুল কারীমের অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকাতে উল্লেখ করেন :

"দুনিয়াতে ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে কুরআন একটি বিশেষ মর্যাদা রাখে, অথচ এ ধরনের ইতিহাস নির্ভর রচনার মধ্যে তার বয়স সবচেয়ে কম। কিন্তু মানুষের উপর বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষেত্রে তা অন্য কারো থেকে পেছনে নয়। এ কুরআন একটি নতুন মানবীয় চিন্তাধারা সৃষ্টি করতে এবং একটি নতুন নীতি-নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপনে সক্ষম হয়েছে।"[২]

অন্য আরেকজন বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ হার্টউইগ হার্শফেল্ড (Hartwig Hirschfeld লিখেছেন :

"আমাদের এতে আশ্চর্য লাগে যে, কুরআন সকল জ্ঞানের উৎস। আসমান-যমীন, মানবজীবন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারিগরী, যে সকল বিষয় তাতে আলোচনা হয়েছে, তা সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে এবং তাফসীর গ্রন্থসমূহে তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এর উপর ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। ফলে, মুসলমানদের মাঝে পরোক্ষভাবে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির পথ সুগম হয়েছে। সে কেবল যে আরবদেরকেই প্রভাবিত করেছে এমন নয়, বরং তা ইয়াহূদী দার্শনিকগণকে ধর্মীয় ও প্রাকৃতিক

১. History of Modern Philosophy, p. 5

২. Rev. G. Margolioths In Introduction to the Koran by J. M. Rodweel. London-(1918)

বিষয়ে আরবদের অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। পরিশেষে, খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব আরব ধর্মতত্ত্বদ্বারা যে পরিমাণ উপকৃত হয়েছে, তার উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

"আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ইসলামের প্রচেষ্টা শুধু ধর্মীয় বিষয়াদির মাঝে সীমাবদ্ধ। গ্রীক সৌরবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক রচনাবলি অধ্যয়ন করার কারণে তাদের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার প্রতি মনোযোগী করে তোলে। মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে দুনিয়া যে অহী লাভ করেছে, তাতে সৌরজগতের ঘূর্ণিপাকের আলোচনা করা হয়েছে এবং তা তার পূজা দেবার জন্য নয়, বরং তা আল্লাহ্ পাকের নিদর্শন ও মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকার কারণে করা হয়েছে। সমস্ত মুসলিম জাতি-গোষ্ঠী সৌরজগত সম্পর্কে সাফল্যের সাথে পর্যালোচনা করেছে শত শত বছর পর্যন্ত; তারাই এ বিদ্যার ধারকবাহক ছিল এবং এখনো পর্যন্ত অধিকাংশ নক্ষত্র ও গ্রহসমূহের নাম ও তাদের গতিবিধি বিষয়ক শব্দগুলো আরবদের ব্যবহৃত। মধ্যযুগে ইউরোপের সৌরবিদ্যার পণ্ডিতগণ আরবদের ছাত্র ছিলেন।

এভাবে কুরআন চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যায়নের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে এবং সাধারণভাবে প্রকৃতিবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করতে এবং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।"[১]

১. Hartwitg Hirschfeld New Reseharches into Composition and Exegesis of the Quran, London. (1908) p. 9

জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা ধর্মীয় বিষয়ে উপকৃত হওয়া এবং মানব প্রকৃতি ও বিশ্বজগৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রতি উৎসাহ প্রদান

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে প্রাচীন ধর্মসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি

আসমানী ধর্মসমূহ ও গ্রন্থাবলী থেকে এমন কোন ধর্ম ও গ্রন্থের কথা আমাদের জানা নেই, যা বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগাতে এবং তাদ্বারা উপকৃত হতে, চিন্তা-ভাবনা ও অভিজ্ঞতাসমূহ হতে ফলাফল বের করতে, কারণ-উপকরণ, ফলাফল ও পরিণতি এবং তার সূচনার মাঝে সম্পর্ক জানা এবং বিশ্ব জগত হতে উপদেশ গ্রহণ ও তা হতে অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের আহ্বান করা হয়েছে। আর নিজের পরিবেশের উপর চিন্তা-ভাবনা করে মানবীয় যোগ্যতাকে কাজে না লাগানো, মানব প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের মাঝে থাকা বিস্তৃত নিদর্শনসমূহ থেকে বিমুখতা, দেশ ও জাতিসমূহের জীবনের অতীত ঘটনাসমূহ থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ না করা এবং ব্যক্তি ও সমাজ, দলীয় ও রাষ্ট্র পর্যায়ের কর্মকাণ্ড ও নীতি-নৈতিকতার পরিণতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার কারণে পবিত্র কুরআনের মত কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে।

দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির দাওয়াত

পবিত্র কুরআন বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা (যার মধ্যে চোখের বড় গুরুত্ব রয়েছে) কাজ নিতে এবং সঠিকভাবে দেখার জন্য অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে– যাতে মানুষ সাধারণ দৃষ্টি হতে অন্তর্দৃষ্টি পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়। এর প্রথম স্তর সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ۔

"তারা কি লক্ষ্য করে না যে, অবশ্যই আমি উষ্ণ ভূমির উপর পানি বর্ষণ করি। অতঃপর তার মাধ্যমে শস্য উদ্‌গত করি– যা থেকে আহার করে তাদের জীবজন্তু ও তারা নিজেরা। তবুও কি তারা লক্ষ্য করবে না।" [সূরা সাজদা : ২৭]

অধিকন্তু তিনি এ বিরাট শক্তি ও নিয়ামত (দৃষ্টিশক্তি) কাজে না লাগানোর কারণে তিরস্কার ও নিন্দা করেছেন। কারণ, তা হিদায়াত ও সুপথ লাভের মাধ্যম।

فَعَمُوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ۔

"ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হলেন। অতঃপর পুনরায় তাদের অনেকে অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। তারা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ দ্রষ্টা।" [সূরা মায়িদা : ৭১]

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْلٰى وَالْبَصِيْرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ۔

"বলুন, অন্ধ আর চক্ষুষ্মান কি সমান? তোমরা কি অনুধাবন কর না।"

[সূরা আন'আম : ৫০]

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْلٰى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ۔

"দু'দলের উপমা অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তিসম্পন্নের ন্যায়। অবস্থায় দু'দল কি সমান? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?"

[সূরা হূদ : ২৪]

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْلٰى وَالْبَصِيْرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمَاتُ وَالنُّوْرُ۔

"বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক?"

[সূরা রা'দ : ১৬]

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْلٰى وَالْبَصِيْرُ۔ وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّوْرُ۔

"সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান। আর না অন্ধকার ও আলো।"

[সূরা ফাতির : ১৯-২০]

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিদর্শনাবলীকে উপেক্ষা করা ও তা এড়িয়ে যাওয়ার উপর শক্ত ভাবে সতর্ক করে ইরশাদ করেন :

وَكَأَيِّنْ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ۔

"আকাশমণ্ডলী ও যমীনের মাঝে অনেক নিদর্শন রয়েছে। তারা প্রত্যক্ষ করে। তা সত্ত্বেও তারা তা হতে বিমুখ।" [সূরা ইউসুফ : ১০৫]

অন্যত্র চোখওয়ালাদেরকে লজ্জা দেবার জন্য ইরশাদ করেন :

فَاعْتَبِرُوْا يٰاُولِى الْاَبْصَارِ۔

"হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।" [সূরা হাশর : ৩]

আকল-বুদ্ধি দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং জ্ঞানীদেরকে লজ্জা দেবার জন্য تعقلون শব্দটি পবিত্র কুরআনে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি এ ধরনের আয়াতের সংখ্যা তেইশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ঐ সকল আয়াতে :

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ۔ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۔ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ۔

এ ধরনের বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এখানে আমরা কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি–

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ۔

"এভাবে আল্লাহ্ তাঁর বিধানসমূহ তোমাদের জন্য খুলে খুলে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার।" [সূরা বাকারা : ২৪২]

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ۔

"অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। যদি তোমরা অনুধাবন কর।" [সূরা আলে ইমরান : ১১৮]

وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ۔ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۔

"যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আখিরাতের আবাসই শ্রেয়। তোমরা কি এটা অনুধাবন কর না?" [সূরা আ'রাফ : ১৬৯]

لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۔

"আমি তো তোমাদের কাছে অবতীর্ণ করেছি কিতাব, যাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ। তবু কি তোমরা বুঝবে না?" [সূরা আম্বিয়া : ১০]

وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ وَبِالَّيْلِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۔

"তোমরা তো তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো অতিক্রম করে থাক সকাল-সন্ধ্যায়। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?" [সূরা সাফফাত : ১৩৭-১৩৮]

জাহান্নামাবাসী এ পবিত্র ইন্দ্রিয় কাজে না লাগাবার কথা আলোচনা করে বলবে :

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔

"তারা আরো বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগাতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না।" [সূরা মুলক : ১০]

এভাবে يعقلون শব্দটি প্রশংসা ও ইতিবাচক প্রসঙ্গে বিশ বারের অধিক ব্যবহৃত হয়েছে।

চিন্তার আহ্বান জানানো, চিন্তাবিদদের প্রশংসার ক্ষেত্রে এবং চিন্তাশক্তিকে কাজে না লাগানো ব্যক্তিদের নিন্দায় পবিত্র কুরআনের আচরণ এটাই। কাজেই এ পবিত্র কুরআনে تفكر (চিন্তা) শব্দটি এগার বার এসেছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا۔

"যারা দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহ্র যিকির করে এবং আকাশমণ্ডলী ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বলে, হে আমাদের রব! আপনি এটা অহেতুক সৃষ্টি করেন নি।" [সূরা আলে ইমরান : ১৯১]

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔

"আপনি ঘটনা বর্ণনা করুন, যাতে তারা চিন্তা করে।" [সূরা আ'রাফ : ১৭৬]

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔

"এতে অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" [সূরা রা'দ : ৩]

এই চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে মুমিন ও আল্লাহ্র পরিচয় লাভকারী বান্দা ঐ মহাসত্য পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়– যে ব্যাপারে পবিত্র কুরআন তাদের ভাষায় ব্যক্ত করেছে :

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا۔

"হে আমাদের প্রভু! আপনি এসব কিছু অহেতুক সৃষ্টি করেননি।"
[সূরা আলে ইমরান : ১৯১]

চিন্তার আহ্বানের প্রভাব ও সুফল

এর ফলে ঐ চিন্তাগত তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়– যা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও কারিগরী এবং মানব সভ্যতা-সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করলো। আর তার প্রভাব বিশ্বজগতের ওপর পড়ল, যেন তার কারণে একটি প্রশস্ত বাতায়ন ও জানালা

খুলে গেল– যা থেকে আলো ও মুক্ত বাতাস প্রবাহিত হতে লাগল। ইসলাম যেন সেই তালা ভেঙ্গে বা খুলে দিল– যা স্বাধীনতা ও সুস্থ চিন্তার শত্রুরা এবং সনাতন ধর্মের ভ্রান্ত প্রতিনিধিগণ মানুষের বিবেক-বুদ্ধির উপর চাপিয়ে রেখেছিল। বিশ্ববাসী হাজার বছরের গভীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলো। মানবতা ঐ নিদ্রা থেকে জেগে চোখ কচলিয়ে নিল। অতঃপর হাজার বছরের হারিয়ে যাওয়া উন্নতি পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে এবং পথের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে তীব্র গতিতে অগ্রসর হতে লাগল। এ বিশ্বজনীন প্রভাব ও তার বিভিন্নমুখী বিপ্লবের ব্যাপারে একজন ফরাসী পণ্ডিত (Jolivet Castelot) তার মূল্যবান গ্রন্থ ইতিহাসের আইন (La loi de Histoire)-এ উল্লেখ করেছেন :

"মুহাম্মদ (সা)-এর ইনতিকালের পর আরবরা অতি দ্রুত উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করে। সে সময় ইসলাম প্রচারের জন্য সময়ও বড়ই উপযোগী ছিল। সেই সাথে ইসলামি সভ্যতাও বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করে এবং বিজয়ের সূত্রে তা সর্বত্র প্রসার লাভ করতে থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কাব্য-সাহিত্যে তাদের প্রভাব বিকশিত হতে থাকে। এভাবে আরবরা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত নিজেদের হাতে জ্ঞানের মশাল বহন করে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐ সকল শাখায় তারা প্রতিনিধিত্ব করে– যার সম্পর্ক ছিল দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ণ, চিকিৎসাশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাথে। তারা যে শুধু প্রচলিত অর্থেই চিন্তানায়ক, আবিষ্কারক ও উদ্ভাবক ছিল তাই নয়, বরং তারা নিজেদের শিক্ষা-সেবাকে অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে, তারা প্রকৃত অর্থে চিন্তানায়ক ও জ্ঞানের উদ্ভাবক হবার সত্যই যোগ্য ছিল। আরবীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বয়স কম ছিল কিন্তু তার প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ছিল। এখন আমরা তার পতনে আক্ষেপই করতে পারি।"

অগ্রসর হয়ে তিনি আরো উল্লেখ করেন :

"শাসকগণ যদিও জমিদারী মেজায রাখত। তাদের দ্বারা যে কাজ হয়েছে তা তাদের ব্যক্তিত্বের অনেক উর্ধ্বে ছিল। এরই ফলে একটি বিস্ময়কর সভ্যতা অস্তিত্ব লাভ করল। ইউরোপ আরব সভ্যতার অনুগ্রহপ্রাপ্ত। বিশেষত, যখন তারা দশম শতাব্দী হতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজয়ী ও শাসক ছিল ইউরোপ তখন তাদের দার্শনিকসুলভ ও জ্ঞান-চিন্তাদ্বারা উপকৃত হয়েছে– যা মধ্যযুগে নীরব প্রভাব ফেলেছে। আরব সভ্যতা-সংস্কৃতি, আরব জ্ঞান-বিজ্ঞান, আরব সাহিত্য, শিল্পকলার সামনে আমাদেরকে অজ্ঞ ও গোঁয়ার মনে হয়। তারা ঐ স্বাস্থ্যকর পরিবেশ দ্বারা উপকৃত হয়েছে– যা সে যুগে আরব চিন্তাধারার কারণে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

"এ চারশতকে আরব সভ্যতা ছাড়া অন্য কোন সভ্যতা ছিল না। তখন আরব মনীষীগণই এ পতাকা উত্তোলন করে রেখেছিল।"[১]

গুস্তাভ লি বন (Gustave le Bon) লিখেছেন :

"যা আধুনিক বিজ্ঞানের উৎসের মর্যাদা রাখে, তাকে লোকেরা বেকনের (Francis Bacon) উদ্ভাবন বলে মনে করে। কিন্তু এখন স্বীকার করা জরুরী যে, এ পদ্ধতি পুরোটাই আরবদের আবিষ্কৃত।"

ব্রিফাল্ট (Robert Briefault) তার The Making of Humanity গ্রন্থে উল্লেখ করেন :

"ইউরোপের উন্নতির এমন কোন দিক নেই যার উপর ইসলামি সভ্যতার অনুগ্রহ ও উল্লেখযোগ্য প্রভাবের গভীর ছাপ নেই।"

তিনি অগ্রসর হয়ে লিখেছেন :

"শুধু রসায়ণ চর্চাই যাতে আরবদের অনুগ্রহ স্বীকৃত, ইউরোপের নবজাগরণ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে এমন নয়, বরং ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি ইউরোপের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ও বহুমুখী প্রভাব ফেলেছে। আর তার সূচনা ঐ সময় হয়েছিল যখন ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রথম কিরণ ইউরোপের উপর পড়তে শুরু করেছিল।"[২]

---

১. الاسلام والحضارة العربية. للاستاذ محمد كرد على পৃঃ ৫৪৩/৫৪৪

২. The Making of Humanity. p. 202

বিশ্বনেতৃত্ব প্রদানকারী, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নীতি-নৈতিকতার পতাকাবাহী এক জাতির উত্থান

একটি আদর্শ নেতৃত্ব প্রদানকারী জাতির প্রয়োজন

সুদীর্ঘ মানব ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, নৈতিক বিজ্ঞান যে বিষয়গুলোকে পূর্ণ সমর্থন করে, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো– উন্নততম উদ্দেশ্য, ভদ্রোচিত শিক্ষা ও কর্মের উন্নততম দৃষ্টান্ত ঐ সময় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর যদি তা প্রতিষ্ঠিত হয়ও, তবে তা স্থায়ী ও স্থিতিশীল হতে পারে না যতক্ষণ না তার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য একটি মানব গোষ্ঠী (বরং সঠিক অর্থে এমন একটি উম্মত) না থাকে যারা উক্ত দাওয়াত ও আন্দোলনের পতাকাবাহী হবে এবং এর পথে সচেষ্ট সংগ্রাম করবে ও নিজেদের বাস্তব জীবনে তা বাস্তবায়ন করবে।

এ কারণে আমরা দেখতে পাই যে, অনেক নবী (আ.)-এর (সমাজ সংস্কারক, চরিত্র ও নীতি শিক্ষাদানকারী শিক্ষক ও বিজ্ঞ পণ্ডিতদের কথা দূরে থাকুক) শিক্ষাসমূহ এজন্য দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি যে, তার পৃষ্ঠপোষকতা করার মত কোন উম্মত ছিল না, যারা তার মিশনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, এ রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করবে এবং যারা নিজেদের জীবনে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে তার বাস্তব নমুনা পেশ করতে পারত। এমনটি না হবার কারণে তাদের পরিণতি এমন হলো যে, তাঁরা যে অঞ্চলগুলোতে প্রেরিত হয়েছিলেন সেখানকার জীবন পদ্ধতি এরূপ স্রোতধারার মতো থেকে গেল যার উপরিভাগ সমান থাকে। আর ঐ সকল জাতি-গোষ্ঠীর পরিণতি ঐ বিশৃংখল জীব-জন্তুর মতো হয়ে গেল যার কোন রাখাল ও রক্ষক নেই।

নির্বাচিত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত উম্মত

আল্লাহ্ তা'আলা যখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মুহাম্মদ (সা) শেষ রাসূল ও খাতেমুল আম্বিয়া হবেন, তাঁর পরে আর না কোন নবীর আগমন ঘটবে, আর না কোন কিতাব অবতীর্ণ হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বমানবতাকে ঐ বিপদ হতে মুক্ত করলেন এবং মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে একটি পূর্ণাঙ্গ উম্মত প্রেরণ করলেন, এতে যেন মুহাম্মদ (সা)-এর প্রেরণ দুইবার হলো; কেননা এতে নবী

প্রেরণের পাশাপাশি উম্মত প্রেরণও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এমন প্রশংসা করেছেন, যা সাধারণত (নবী ব্যতীত) আল্লাহ্র পক্ষ হতে প্রেরিত ও দায়িত্ব প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ۔

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের জন্য। তোমরা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দকাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখবে।" [সূরা আলে ইমরান : ১১০]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا۔

"এভাবেই আমি তোমাদেরকে ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা সাক্ষী হতে পার। আর রাসূল হবেন তোমাদের উপর সাক্ষী।"

[সূরা বাকারা : ১৪৩]

প্রিয়নবী (সা) হাদীস শরীফেও সাহাবাদের একটি দলকে লক্ষ্য করে এরূপ শব্দ ব্যবহার করে ইরশাদ করেছেন :

اِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ۔

"তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে সহজকারী হিসেবে, কঠোরতার জন্য নয়।" [বুখারী শরীফ]

প্রতিনিধিত্ব ও দাওয়াতের এ যিম্মাদারী এবং নিজেদের দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতার এ অনুভূতি সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও মহান তাবেয়ীদের অন্তরে তখনো জাগ্রত ছিল যখন হযরত সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা) নিজের প্রতিনিধি হিসেবে হযরত রিবয়ী ইবন আমের (রা)-কে[১] পারস্য সেনাপতি রুস্তমের দরবারে তার দাওয়াতে প্রেরণ করেন এবং রুস্তম যখন রিবয়ী ইবন আমের (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন– তোমরা এখানে কেন এসেছ? তখন তিনি একজন মুমিন ও ধর্মপ্রচারক হিসেবে উত্তরে বলেন :

---

১. তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী ছিলেন। দেখুন, আল-ইসাবা ১ খঃ পৃঃ ৫০৩।

اَللّٰهُ اِبْتَثَنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ عِبَادَةِ الْعِبَادِ اِلٰى عِبَادَةِ اللّٰهِ وَحْدَهٗ وَمِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا اِلٰى سَعَتِهَا وَمِنْ جَوْرِ الْاَدْيَانِ اِلٰى عَدْلِ الْاِسْلَامِ۔

"আল্লাহ্ ত'আলা আমাদেরকে এজন্য প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি যাকে চান আমরা তাকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহ্র দাসত্বের প্রতি উদ্বুদ্ধ করব এবং পার্থিব সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে ও ধর্ম সমূহের জুলুম থেকে উদ্ধার করে ইসলামের ন্যায়-নীতির ছায়াতলে আনয়ন করব।"[১]

সমাজ ও সংস্কৃতির অঙ্গনে সুস্থ বিপ্লবের প্রয়োজন

এ দৃষ্টিভঙ্গি মানবতার ভবিষ্যতকে অত্যন্ত প্রভাবিত করে এবং তা মানুষের জন্য ধর্ম ও আন্দোলন এবং চিন্তাজগতের ইতিহাসে এক নতুন অভিজ্ঞতার মর্যাদা রাখে– যা ইতিহাসে এক নতুন বিপ্লব সৃষ্টি করে। কারণ খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিশ্বের পরিস্থিতি (যা সাধারণত সব যুগেই হয়ে থাকে) এমন ছিল না যে, তার কারণে কিছু ভালো মানুষ প্রভাবিত হতো। এ জন্য পবিত্র কুরআনে অভিশপ্ত ইয়াহূদীদের মাঝেও কিছু ভালো মানুষ বিদ্যমান থাকার সাক্ষ্য প্রদান করে :

لَيْسُوْا سَوَاءً مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اٰنَاۤءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ۔ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ۔

"(আহলে কিতাব) সবাই সমান নয়। কিতাবীদের মাঝে এক দল অবিচল রয়েছে। তারা আল্লাহ্র আয়াতকে রাতের বেলায় পাঠ করে এবং সিজদা করে। তারা আল্লাহ্ ও কিয়ামতের দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজের নিষেধ করে এবং কল্যাণকর কাজে তারা প্রতিযোগিতা করে। এরাই সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্গত।" [সূরা আলে ইমরান : ১১৩-১১৪]

যদিও মানব সমাজ ও মানবীয় কর্মতৎপরতায় ঐ সকল ভাল লোকের কোন প্রভাব ছিল না। কারণ, তারা সমাজের গুটিকতক লোক ছিল। আর সাধারণত সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী গুটি কতক মানুষকে গুরুত্ব দেয় না। প্রত্যেক যুগ ও সমাজে এমন কিছু সৎকর্মপরায়ণ লোক থাকে এবং এখনো আছে যারা নিজেদের

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭খঃ পৃঃ ৩৯

কিছু আমল-আখলাক ও ইবাদত-বন্দেগীতে অন্যদের তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রাখে। কিন্তু জাতি-গোষ্ঠী, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনে যে সংকট ও শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তা ঐ সময় পর্যন্ত পূর্ণ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ কল্যাণ ও সৎকর্মপরায়ণতা, উত্তম আদর্শ ও তার বাস্তব নমুনা উম্মত ও মানব সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত না হয়। যারা উন্নতির নববী শিক্ষা, ভদ্রজনিত রীতিনীতি, আদর্শ, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কর্মের প্রতিনিধিত্ব, রাষ্ট্র ও রাজনীতি, ব্যবসা ও লেন-দেন, ব্যক্তি ও সমাজ জীবন, ব্যক্তি ও সমাজের সাথে আচার-আচরণ, এবং জাতি গোষ্ঠী ও প্রশাসনের সাথে আচার-আচরণ, লেনদেন, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি, সন্ধি ও যুদ্ধ, দারিদ্র্য ও বিত্তবৈভব সর্ব অবস্থায় ও সকল পরিস্থিতিতে পালন করে এবং যদি এগুলো ঐ উম্মত ও দলের সাধারণ কর্মপন্থা ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য না হয়।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) এবং সেই সব সৌভাগ্যবান মানুষ যারা নবূয়তের স্নেহছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছেন (এবং ঈমানী ও কুরআনী মাদরাসায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন) তারা সকলেই ঐ সমস্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।

একজন নিরপেক্ষ ও বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ পশ্চিমা পণ্ডিত সাহাবা কিরাম (রা) সম্পর্কে অত্যন্ত সফল চিত্র তুলে ধরেছেন এবং তাঁদের উল্লেখযোগ্য ও যৌথ বৈশিষ্ট্য সমূহের প্রতি আলোকপাত করেছেন– যাঁরা নবূয়তের সজীব বাগিচা ও কুরআনের বসন্ত ঋতু বলার উপযুক্ত। জার্মান পণ্ডিত কায়েতানী (Caetani) তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন :

"তারা ছিলেন রাসূল (সা)-এর আখলাকী উত্তরাধিকারের সত্যিকার প্রতিনিধি, ভবিষ্যত ইসলাম প্রচারক এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের পর্যন্ত যে শিক্ষা-দীক্ষা পৌঁছিয়ে ছিলেন। তাঁরা ছিলেন তাঁর আমানতদার। রাসূল (সা)-এর সার্বক্ষণিক সান্নিধ্য লাভ এবং তাঁর সাথে মহব্বতপূর্ণ সম্পর্ক তাদেরকে চিন্তা-চেতনার এমন এক জগতে পৌঁছে দিয়েছিল যা থেকে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত সভ্য সমাজ আর কখনো কেউ দেখেনি।

"প্রকৃতপক্ষে ঐ সব মানুষের মাঝে সর্বদিক হতে সর্বোকৃষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। আর পরবর্তীতে তাঁরা যুদ্ধের সংকটময় অবস্থাতেও এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে, মুহাম্মদ (সা)-এর চিন্তার বীজ উদগত উর্বর জমিতে বপন করা হয়েছিল। ফলে তা থেকে উন্নততর যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেছিল। এ সকল ব্যক্তি পবিত্র গ্রন্থের আমানতদার ও তার রক্ষক ছিলেন এবং

প্রিয়নবী (সা) থেকে যে শব্দ বা হুকুম তাঁরা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা সুন্দরভাবে সংরক্ষণকারী ছিলেন।

"তাঁরা ছিলেন ইসলামের সম্মানিত অগ্রপথিকের কাফেলা– যাঁরা মুসলিম সমাজের প্রথম যুগের ফকীহ, আলিম ও মুহাদ্দিস জন্ম দিয়েছেন।"[১]

বিশ্ব তদারকি

মুসলিম উম্মাহর উপর বিশ্ব তদারকি, চারিত্রিক ও মানসিকতা, ব্যক্তিগত ও আন্তর্জাতিক কর্মপদ্ধতির পর্যবেক্ষণ করা, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, সত্যের সাক্ষ্য প্রদান, 'আমরু বিল মা'রূফ' (সৎকাজের আদেশ), 'নাহী আনিল মুনকার' (মন্দকাজে বাধা প্রদান) করার যিম্মাদারী অর্পণ করা হয়েছে। আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অলসতার কারণে জবাবদিহি করতে হবে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ۔

"হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পূর্ণ আনুগত্য ও ন্যায় সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকবে। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করবে; এটাই তাকওয়ার নিকটতম এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমরা যা কর তার পূর্ণ খবর রাখেন।" [সূরা মায়িদা : ৮]

সাথে সাথে এ উম্মতকে স্বীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অবহেলার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। কারণ, এর ফলশ্রুতিতে তারা বিপদ ও সংকটের মাঝে পতিত হতে পারে আর দুনিয়াতে ফিতনা-ফাসাদ, বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে পারে। তাই ঐ ক্ষুদ্র মানব গোষ্ঠীকে (যা মাদানী জীবনের প্রথম যুগে কয়েক শতের মত ছিল) লক্ষ্য করে এবং তাঁদেরকে ঈমান, আকীদা-বিশ্বাস ও ইসলামি দাওয়াতের ভিত্তিতে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে :

اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ۔

---

১. Caetani Annali Del Islam. Vol. 11. p. 429 যা গৃহীত হয়েছে– T. W. Arnold : Preaching of Islam.(London. 1925). p. 41-42.

"যদি তোমরা তা না কর, তাহলে দুনিয়াতে ফিতনা ও মহাবিপর্যয় সৃষ্টি হবে।" [সূরা আনফাল : ৭৩]

তাহলে কি আজকের মুসলিম উম্মত এ নির্দেশের আওতাভুক্ত নয়? যাদের দ্বারা সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ে উঠেছে এবং যারা বড় বড় রাষ্ট্র ও জনশক্তির অধিকারী? যদি তারা নেতৃত্ব ও ধর্মপ্রচারকের পদমর্যাদা ত্যাগ করে, যদি তারা তাদের সামাজিক যিম্মাদারী ছেড়ে দেয়, যদি তারা চিন্তা-চেতনা ও আখলাকের তদারকি করা ত্যাগ করে, যদি তারা অসহায়ের সাহায্য ও জালিমের নিন্দা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে দুনিয়াতে তাদের এ বিরাট অবহেলা ও বিপদজনক ভুলের কি পরিমাণ কুপ্রভাব পড়বে?

কুরআন এ উম্মতের নেতাসুলভ দায়িত্ববোধ, সংশোধন ও দাওয়াতের যিম্মাদারী, 'আমরু বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার'-এর দায়িত্ববোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার লক্ষ্যে পূর্ববর্তী জাতিদের বরাত দিয়ে এবং তা দ্বারা চেতনা-অনুভূতি জাগ্রত করার লক্ষ্যে বলেছে :

فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُوْلُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِيْ الْأَرْضِ إِلاَّ قَلِيْلاً مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا أُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ-

"তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে যাদের আমি রক্ষা করেছিলাম, তাদের মধ্যে অল্প কিছু সংখ্যক ছাড়া বিবেক জাগ্রত মানুষ ছিল না– যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করা হতে নিষেধ করতো। সীমালঙ্ঘনকারীরা তারই অনুসরণ করত যাতে তারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেত এবং তারা ছিল অপরাধী।" [সূরা হূদ : ১১৬]

ইসলামি কবি ড. মুহাম্মদ ইকবাল বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন তাঁর 'ইবলিশের পার্লামেন্ট' খ্যাত কাব্যে। তিনি পার্লামেন্টের সভাপতি ইবলিশের ভাষায় এ বিপদের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ, মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব, তাদের জাগরণ ও বিশ্বের যিম্মাদারী গ্রহণ করারায় ইবলিশী প্রশাসনে বড় বিপদ সৃষ্টি হয়। তাই ইবলিশ তার উপদেষ্টা পরিষদকে হুশিয়ার করে বলে :

توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات
ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات
تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے
تا بساط زندگی پر اس کے سب مہرے ہوں مات

خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام
چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات —
ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر
جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔
ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں
ہے حقیقت جس کے دیں کی احتساب کائنات۔

"যে জাতির তাকবীর ধ্বনি ভেঙে দিত ছয় দিকের প্রহেলিকা,
সেই আল্লাহ্-অন্বেষীর অন্ধকার রাত যেন আলোকিত না হয়।
তোমরা তাদেরকে অজ্ঞ রেখো নেতৃত্বময় জগৎ হতে,
যাতে তারা ক্ষণস্থায়ী জগতের কর্তৃত্ব অন্যদের হাতে তুলে দেয়।
কিয়ামত পর্যন্ত মুমিন দাস হয়ে বাঁচবে, এরই মাঝে কল্যাণ নিহিত।
ঐ কাব্য ও তাসাউফ তাদের জন্য উত্তম,
যা তাদেরকে জীবনের কর্মতৎপরতা হতে বিমুখ করে রাখে।
প্রতিটি মুহূর্ত আমি শংকিত থাকি এ উম্মতের জাগরণের কারণে,
কারণ– তাদের ধর্মের সারকথা হল, বিশ্বজগতের তদারকি করা।"

[আরমুগানে হিজায]

উম্মতের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব ও পর্যবেক্ষণ

এ দৃষ্টিকোন হতে এ বিষয়টি আবশ্যক হয়ে যায় যে, মানব সভ্যতার মাঝে কার্যকরী প্রভাব অব্যাহত রাখতে হবে এবং কিছুদিন পর পর তা নতুনভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। নাশকতামূলক ও অনিষ্ট সাধনকারী উপাদানসমূহ এবং ফাসিদ ও ধ্বংসাত্মক চিন্তা-চেতনা হতে সব সময় তাকে হিফাজত করতে হবে।

এর দু'টি বিশেষ কারণ রয়েছে। প্রথমত– এ জন্য যে, বিশ্বের জাতি-গোষ্ঠী কল্যাণ ও ফাসাদের নিত্যনতুন ও বিপরীতমুখী উপাদানের অনুগত ও তা দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর জীবন সর্বদা গতিশীল এবং এ কাফেলা কখনো কোথাও থেমে থাকে না। এ জন্য কিছুদিন পরপর তার গতিবিধি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন এবং তার নতুন নতুন প্রয়োজনগুলো পূরণ করা জরুরী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শেষ যুগে ধ্বংসাত্মক ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী আন্দোলন ও দর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মুসলিম উম্মাহ বিশ্ব নেতৃত্বের ময়দানে হতে যেন নিজেদের খোলসে বন্দী হয়ে রয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, মুসলিম উম্মাহই হলো সর্বশেষ আসমানী কিতাবের ধারক-বাহক একটি চিরন্তন উম্মত এবং বিশ্বমানবতার আশার কেন্দ্র। এজন্য তাদের উচিত নিজেদের মিশনকে বুকের সাথে ধারণ করে রাখা এবং মানব কাফেলার নেতৃত্ব, পৃথিবীর তদারকি ও আকীদা-বিশ্বাস, আখলাক-চরিত্র, ব্যক্তি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর দৃষ্টি রাখা। কারণ, কোন জাতি গোষ্ঠী কেবল ইতিহাসে ভর করে অথবা নিজেদের সোনালী ঐতিহ্যের বদৌলতে বা অতীত কৃতিত্বের দ্বারা নয়, বরং অব্যাহত প্রচেষ্টা, সার্বক্ষণিক কর্মতৎপরতা, স্বতন্ত্র দায়িত্ববোধ, সব ধরনের ত্যাগের মানসিকতা, নতুনত্ব ও অনন্যতা এবং নিজেদের সতেজ ও সজীব কর্মদক্ষতা ও কল্যাণকামিতা দ্বারা উজ্জীবিত ও জ্যোতির্ময় হয়ে থাকে। কিন্তু যখন তারা নিজেদের অবস্থান ও মর্যাদা ছেড়ে দিয়ে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তারা ইতিহাসের পুরাতন অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয় এবং যুগ তাদের বিস্মৃতির শেলফে রেখে দেয়। এজন্য উম্মতে মুহাম্মদীর কর্তব্য হলো, আবার নতুনভাবে নিজেদের দাওয়াতী, সাংস্কৃতিক ও নেতৃত্বসুলভ ভূমিকার সাথে কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠা।

আকীদা-বিশ্বাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশ্ব ঐক্য

অনন্য বিশ্ব ঐক্য

এটি এমন এক বিশ্ব ঐক্য, যার ব্যাপকতা, গভীরতা ও স্থায়িত্বের নজীর ইতিহাস কখনো মানব সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থায় দেখেনি। এ ঐক্য আকীদা-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এখনো তা বিদ্যমান রয়েছে। আর এ আকীদা বিশ্বাসগুলো হলো– এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস, প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নবূয়ত ও তাঁর খতমে নবূয়তের প্রতি বিশ্বাস এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রতি বিশ্বাসের নাম। এখানে বাহ্যত কুদরতে ইলাহী প্রত্যক্ষ করা যায় এবং এর ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। বিভিন্ন বস্তুর প্রকৃতি, তার গুণগত মান ও মূল্যায়ন, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান, সৃষ্টি ও তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য, এ জীবনের অস্থায়িত্ব এবং ঐ সকল গুণের প্রতি বিশ্বাস নির্ধারণ হয়ে যায়– যা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যেগুলো প্রিয়নবী (সা)-এর অনুপম আদর্শ, সাহাবা (রা)-গণের জীবন এবং ইসলামের প্রথম শতাব্দীর মুসলমানগণ– যা নিজেদের সাধ্য ও যোগ্যতার তারতম্য অনুযায়ী উপস্থাপন করেছিলেন– যা সময়, পরিবেশ, শিক্ষা-দীক্ষা এবং বহিরাগত প্রভাবের স্বাভাবিক পরিণতি বলে গণ্য হয়। আর এ ঐক্য সকল ইসলামি সমাজে এবং ইসলামের আগমনের পর সকল যুগে যৌথ বিষয় হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে। আর একটি উম্মত ও এক ধর্মের অনুসারী হওয়া সকল যৌথ উপাদানের (Common Factors) চেয়ে বেশি স্পষ্ট, আরো বেশি অনন্য ও আরো বেশি গভীরতার অধিকারী।

এরপর ইসলামের সাংস্কৃতিক ঐক্য, যার অনেকটাই ইসলামি বিধি-বিধান, নীতি-নৈতিকতার শিক্ষার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত– যদিও মাপকাঠি ও আমলের পদ্ধতিগত কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। আর মতপার্থক্য থেকে এড়িয়ে থাকা মোটেও সম্ভব নয়। কারণ, তা ইসলাম গ্রহণকারী জাতি-গোষ্ঠী, যুগরাষ্ট্র এবং সরকারের ভিন্নতার ফল। কিন্তু এ সভ্যতা ইসলামের বিশেষ ছাপ বহন করে। যেমন– বিশ্বাসে তাওহীদ, সমাজ জীবনে মানবতার সম্মান, সাম্য-সম্প্রীতি, নীতি-নৈতিকতা ও কর্ম পদ্ধতিতে (অন্য ধর্মের তুলনায়) অধিক আল্লাহ্-ভীতি, লজ্জা ও বিনম্রতার অধিকারী। এভাবে কর্মক্ষেত্রে আখিরাতের প্রস্তুতি, আল্লাহ্‌র জন্যই জিহাদ, যুদ্ধের ময়দানে (অন্যান্য সমকালীন বস্তুবাদী সভ্যতার তুলনায়)

অধিক দয়া ও অনন্য ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ এবং ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে অধিকতর পবিত্রতার পরিচয় দেয়– যা আধুনিক ও কল্যাণকর সভ্যতায় সাধারণভাবে পরিচিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হতে অধিক উন্নত ও অনন্য। ঠিক তেমনিভাবে, পশু-পাখির গোশত পাক ও হালাল করার জন্য ইসলামে রয়েছে যবেহ ও কুরবানী করার স্বতন্ত্র পদ্ধতি।

ঐক্যের অনন্য নিদর্শন

বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের নাম, যদিও তারা দূর-দূরান্তে বসবাস করে এবং তাদের ভাষা ও সভ্যতার মাঝে পার্থক্য রয়েছে, তদুপরি অন্যদের তুলনায় স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী এবং বেশির ভাগ তা আরবী ভাষায় ও নবী, সাহাবা, নবী-পরিবার ও নেককার ব্যক্তিগণের নাম থেকে গ্রহণ করা হয়। এসব নামের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা, একত্ববাদ ও দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং প্রিয় নবী (সা)-এর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে অধিকাংশ সময় 'মুহাম্মদ' ও 'আহমদ' নাম রাখা হয়।

মুসলমানদের মাঝে পরস্পর সাক্ষাতের সময় السلام عليكم বলার সাধারণ-রীতি রয়েছে। বিভিন্ন সময় কুরআনের শব্দ ও আয়াতের অংশ মুখে উচ্চারিত হয়। যেমন–

الحمد لله ـ ماشاء الله ـ ان شاء الله ـ انا لله وانا اليه راجعون ـ لا حول ولا قوة الا بالله ـ

এ ধরনের বাক্য বিভিন্ন প্রয়োজন ও সময়ে বলার রেওয়াজ রয়েছে।

এ ধর্মীয় ও সভ্যতাগত ঐক্য, ফরয ও ওয়াজিবসমূহ, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের সময় আরো বেশি করে প্রকাশ পায়। সুতরাং, পাঁচ ওয়াক্ত নামায (বিভিন্ন দেশের সময়ের সাথে মিল রেখে) নির্ধারিত রাকাআতের সাথে বেশির ভাগ মসজিদে জামা'আতের সাথে আদায় করা হয়। আর এ জামা'আতে যে-কোন দেশের, যে-কোন ভাষার, যে কোন মুসলমান শরীক হতে পারে এবং তাতে স্থানীয় শিক্ষা ও হেদায়াত ছাড়াই শুধুমাত্র মুসল্লিদের চাহিদা অনুযায়ী যে কেউ ইমামতি করতে পারে। পবিত্র কুরআনই একমাত্র আসমানী ধর্মীয় গ্রন্থ– যা সকল দেশে ও সকল সময় তারতীল ও তাজবীদের সাথে তিলাওয়াত করা হয় এবং তা হেফজ করা হয়।[১]

---

১. এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা (Encyclopaedia of Britennica)-তে মুহাম্মদ নামের

এমনিভাবে সকল মসজিদে একই শব্দে আযান দেয়া হয়। রমযান মাস (মৌসুমের ভিন্নতা সত্ত্বেও) রোযার মাস হিসেবে পরিগণিত হয়। মুসলমানগণ দু'টি ঈদ, (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা) পালন করে এবং আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য দু'রাকা'আত নামায আদায় করে। অতঃপর নিজেদের অবস্থানগত পার্থক্য সত্ত্বেও খুতবাতে সকল মুসলমান শরীক থাকে। এমনিভাবে হজ্জের জন্য সকলেই দূর-দূরান্ত হতে মক্কা শরীফে উপস্থিত হয়। আর এসব কিছুই ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসে অবিরাম ঘটছে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিশৃংখলা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় কখনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। এসকল ঘটনা এমন এক ঐক্যের নমুনা পেশ করে– যার তুলনা কোন জাতি-গোষ্ঠী ও অপরাপর সমাজ ব্যবস্থায় পাওয়া যায় না।

পশ্চিমা পণ্ডিতদের সাক্ষ্য

এ অনন্য ঐক্যের বিষয়টি বেশ কয়েকজন পশ্চিমা পণ্ডিত-চিন্তাবিদ ও গবেষক অনুভব করেছেন এবং এর স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আমরা এখানে শুধু কয়েকটি সাক্ষ্য উল্লেখ করাকে যথেষ্ট মনে করছি।

হ্যামিলটন গিভ লিখেছেন

"ইসলাম একটি চিন্তা, যা অত্যন্ত সুশৃংখল। কিন্তু তা বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ঐক্যের আদলে প্রকাশ পেয়েছে। তা স্থান-কাল-পাত্রভেদে এবং স্থানীয় ও ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ– পশ্চিম এশিয়ার ইসলামি কেন্দ্রের সাথে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার এবং মধ্যযুগের স্পেনের গভীর সম্পর্ক ছিল। তাদের সভ্যতা ঐ কেন্দ্রীয় সভ্যতারই একটি শাখা ছিল। তদুপরি তারা তাতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্বের অধিকারী ছিল। ফলে, তারা পশ্চিম এশিয়ার উপরে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এছাড়া, অন্যান্য বৃহত্তর ও স্বাধীন অঞ্চল, যেমন ভারত উপমহাদেশ, ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ রাশিয়ার মরুভূমি এলাকা থেকে চীনের সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত ভারসাম্যময় উপাদানসমূহ এভাবেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এরপরেও তারা সকলেই এবং তাদের প্রত্যেকেই সহজে বোধগম্য ইসলামি রঙকে ধারণ করে থাকে।"[১]

শিরোনামে লেখা হয়েছে যে, কুরআনই একমাত্র কিতাব– যা বিশ্বে সর্বাধিক পাঠ করা হয়।

১. Hamilton A. R. Gibb, Studies on Civilization of Islam. (London-1962) p. 3.

উইলফ্রেড কান্টওয়েল স্মিথ লিখেছেন :

"মুসলমানদের সফলতাই হলো তাদের ধর্মের অভ্যন্তরীণ সফলতা। তারা যে শুধু যুদ্ধের ময়দানে বিজয়ী হয়েছে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে, এমন নয়; বরং তুলনামূলক কম সময়ের মধ্যে তারা জীবনকে একটি সামগ্রিক রূপদানে সফল হয়েছে– যাকে সভ্যতা বলা হয়। ইসলামি সভ্যতার গঠন ও রূপদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী অংশগ্রহণ করেছিল। যেমন– আরব, গ্রীক, মধ্যপ্রাচ্যের সেমিটিক সভ্যতা, ইরানের সাসানী সভ্যতা ও ভারতীয় উপাদানসমূহ ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে, মুসলমানদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তারা ঐ সকল উপাদানকে একটি সমজাতীয় জীবনপদ্ধতিতে একাকার করেছে এবং তাকে আরো উন্নত করেছে। একমাত্র ইসলামই তাকে পূর্ণতা দান করেছে এবং তা অব্যাহত রাখার মত শক্তি সরবরাহ করেছে। জীবনের প্রতিটি শাখায় তা ইসলামি রূপদান করেছে; যদিও তার গঠনগত উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি ভিন্ন ছিল।

"ইসলামি জীবনপদ্ধতি সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করেছে। তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে। এ ইসলামি বিধান স্বীয় শক্তিশালী ও নির্ধারিত প্রবাহের মাধ্যমে সামাজিক রীতি-নীতি ও ইবাদত-বন্দেগী হতে শুরু করে মালিকানা পর্যন্ত সকল বিষয়কে সুশৃংখল ও সুসংহত করেছে। ইসলামি বিধিবিধানই ইসলামি সমাজকে কর্ডোভা থেকে মুলতান পর্যন্ত সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। এ বিধিবিধানই মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং তাদের জীবনের সকল কর্মতৎপরতাকে ফেরেশতাসুলভ বৈশিষ্ট্য দান করে অর্থবহ করেছে। সমাজকে ধারাবাহিকতা প্রদান করে তা যুগের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করেছে। ফলে, রাজা-বাদশাহগণ ধারাবাহিকভাবে আগমন ও প্রস্থান করেছেন কিন্তু ভূপৃষ্ঠে রব্বানী বিধান অনুযায়ী সমাজ গঠনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় তাদের অবস্থান অত্যন্ত গৌণ ছিল।"[১]

ইসলামি সভ্যতার প্রাণ ও প্রকৃতি

ইসলামি সভ্যতা এমন এক সভ্যতা– যার প্রাণ ও প্রকৃতিই হলো আল্লাহ্‌র পবিত্র নাম ও তাঁর প্রতি ঈমান ও ইয়াকীন। এ সভ্যতা আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন হওয়া এবং ঈমান ও আমলের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ জন্য তাকে ধর্মীয় রঙ, রব্বানী প্রকৃতি ও ঈমানী প্রাণ থেকে পৃথক করা অসম্ভব। তাই যদি কখনো তার উপর জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা, জাহিলী অহমিকা, বংশগত দ্বন্দ্ব, বস্তুবাদী

১. Wilfared Cantwell Smith. Islam in Modern History. (New York. 1957) p. 36-37.

মানসিকতা, নৈতিক অবক্ষয়, কিংবা সামাজিক অস্থিরতা বিরাজ করে, তবে তা সাময়িক বা বহিরাগত প্রভাবের ফল। অথবা ঐ ধর্ম, সমাজ ও সামাজিকতার বহিঃপ্রকাশ, যেখানে ঐ মুসলিম জনগোষ্ঠী বসবাস করে। অথবা তা ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকে প্রভাবিত ও উপকৃত না হওয়া এবং পবিত্র কুরআন ও হাদীস, ইসলামের প্রথম ও মৌলিক উৎসের সাথে গভীর সম্পর্ক না থাকার কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

ইসলামি ইতিহাসে সংস্কার ও সংশোধন আন্দোলনের সফলতার রহস্য

এজন্য মুসলিম দেশ ও জাতি-গোষ্ঠীর ইতিহাসে সংস্কার ও সংশোধন, ফাসাদ ও বিদ'আত এবং জাহিলীপনার প্রভাবের বিরুদ্ধে জিহাদ ও প্রতিরোধের এমন অব্যাহত ধারা রয়েছে– যার দৃষ্টান্ত ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্মীয় ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এমনিভাবে, এ মুবারক প্রচেষ্টায় এমন সফলতা অর্জিত হয়েছে যা অন্য সকল জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্মীয় ইতিহাসে বিরল। আর এমনটা হওয়া এ জন্য সম্ভব হয়েছে, কারণ– এ প্রচেষ্টা এ উম্মতের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, তার প্রাণ ও তার চিন্তা-চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তা ঐ সকল মূলনীতি ও বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যাখ্যা, যার উপর এ উম্মতের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং এখান থেকে তাদের ঐতিহাসিক সফর শুরু হয়েছিল।[১]

মানব সভ্যতাকে কর্মচঞ্চল করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকা উচিত

ইসলামের সাংস্কৃতিক উপহার এবং মানব সভ্যতায় তার অবদানের ব্যাখ্যা এবং মানবতার কাফেলাকে ধ্বংস ও আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করা, তার উন্নতি ও অগ্রগতি সাধনের ক্ষেত্রে ইসলামের সুমহান ভূমিকার কথা আলোচনা করার পর একটি চিরন্তন ও ঐতিহাসিক সত্য বিষয় সুস্পষ্ট করা অত্যাবশ্যক। আর তা হলো, মানব সভ্যতায় প্রভাবশালী কর্মতৎপরতা এবং বিভিন্ন সময়ে তার নতুনভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা; তাকে উপকারী অতীত ও কল্যাণকর বর্তমানের সাথে সংযুক্ত ও সংমিশ্রণ করা এবং তাকে ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর উপাদান এবং ফাসেদ বা বিনষ্টকারী চিন্তা ও উপাদান থেকে রক্ষা করার পদক্ষেপ স্বতন্ত্র ও নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয় তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সত্য এই যে, মুসলিম উম্মাহ ঐ সময় পর্যন্ত মানব সভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে না যতদিন তারা অন্য

---

১. এ বিষয়ে লেখকের গ্রন্থ 'তারিখে দাওয়াত ওয়া আযীমত' প্রথম খন্ডের ভূমিকা এবং এ সাফল্যের উদাহরণ হিসেবে পঞ্চম খন্ড দেখা যেতে পারে।

সভ্যতার দস্তরখানে উচ্ছিষ্ট কুড়াতে থাকবে এবং তাদের ঝর্ণাধারা থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করতে থাকবে, তাদের প্রভাবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকবে। এ অবস্থায় তারা অন্য জাতিকে নিজেদের অনুসারী হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা তো দূরের কথা, অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও সক্ষম হবে না।

এটা তখনই সম্ভব যখন মুসলিম উম্মাহ পরিপূর্ণভাবে তার সভ্যতার স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার ব্যাপারে বিশ্বাসী ও আস্থাশীল হবে এবং তার শিক্ষা-সংস্কৃতি আল্লাহ্ প্রদত্ত ও অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হবার বিষয়ে পূর্ণ ঈমানদার হবে; আর তা সর্ব যুগে ও সকল স্থানে প্রযোজ্য ও কল্যাণকর। কারণ, তা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, কুরআন-সুন্নাহ থেকে সংগৃহীত রব্বানী দিকনির্দেশনা ও প্রিয়নবী (সা)-এর শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সভ্যতার মাঝে শালীনতা ও পাক-পবিত্রতার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। কারণ, তাদের 'তাহারাত'-এর অর্থ শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সমার্থক নয়, আর তাদের শালীনতার অর্থ শুধু চারিত্রিক ও নৈতিক বিশৃংখলা থেকে বিরত থাকার মধ্যে নয়; বরং তার অর্থ ব্যাপক বিস্তৃত এবং এর মর্ম সুদূরপ্রসারী।

ইসলামি জীবনব্যবস্থা পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে কোন প্রকার সামঞ্জস্য রাখে না। কারণ, পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্ম ও বিকাশ একটি বিশেষ ঐতিহ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তির ছত্রছায়ায় ও এক বিশেষ পরিবেশে ঘটেছিল– যার উপর বস্তুবাদের প্রাধান্য রয়েছে এবং এক সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তার উপর ধর্ম বিদ্বেষী ও আখলাক-চরিত্র ও সুস্থ মূল্যবোধের সাথে বিদ্রোহকারীদের শাসন ছিল। যেমন– এ সভ্যতা ও তার ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ডঃ আল্লামা ইকবাল এ মতই ব্যক্ত করেছেন– ع۔ركه ورح اس مدينت كى ره سكى نه عقيف "কারণ এ সভ্যতার রূহ পবিত্র ছিল না।"

নাগরিক সুযোগ-সুবিধা, নতুন নতুন শিল্প আবিষ্কার, বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন এবং ইসলামি সভ্যতার সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব, সরলতা ও বাস্তবতাপ্রিয়তা, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি এবং অপচয় ও অপব্যয় এবং বাহ্যিক সৌন্দর্যের বিকাশ ও জৌলুসপ্রিয়তা থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে পরস্পর সমন্বয় ও সংমিশ্রণ বর্তমানে অত্যন্ত সহজ। যদি মুসলিম দেশ ও সমাজগুলো স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে, ধীরস্থির ও সাহসিকতার সাথে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করার সামর্থ্য লাভ করে এবং তারা যদি বুদ্ধিমত্তা, প্রতিভার দীপ্তি, ইসলামি শিক্ষা ও ইসলামি সভ্যতাকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে ঈমান ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। কারণেই তাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে; সেই সাথে যদি নিজেদের ইসলামি স্বতন্ত্র সত্তা ও ঐতিহ্যের উপর গর্ব করার অনুপ্রেরণা তাদের মাঝে সক্রিয় থাকে।

বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ পয়গাম্বর এবং বিশ্বের জন্য অনুগ্রহ স্বরূপ দ্বীনী দাওয়াত

আমরা এ ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের পর বিশ্বে তার প্রভাব সম্পর্কে আমার পুস্তক 'নবীয়ে রহমত'-এর সমাপ্তি আলোচনার মধ্যমে সমাপ্ত করতে চাই, যাতে পুস্তকটি সুন্দরভাবে সমাপ্ত হয়। মহানবী (সা)-এর শুভাগমনের বরকতে ও তাঁর মহান শিক্ষার বদৌলতে বদলে গেল পৃথিবী, বদলে গেল মানুষের মন-মেজাজ, অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসার স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল। আল্লাহ্‌প্রাপ্তির আগ্রহ ব্যাপক হলো। মানুষের মাঝে এক নতুন ধ্যান-ধারণা, আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার মেজাজ, আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌র সাথে মিলিয়ে দেয়া এবং তাদের উপকার করার আগ্রহ সৃষ্টি হলো। বর্ষার আগমনে যেমন গ্রীষ্মের খরতাপ, লু-হাওয়া, প্রচণ্ড দাবদাহ ও দুর্ভিক্ষঘেরা এক ভয়ংকর ঋতু থেকে মুক্তি লাভ করে এমন এক ঋতুতে পৌছে, যেখানে গলাগলি করছে ফুল আর বসন্ত, নতুন নতুন কুঁড়ি ফোটে, সবকিছু সবুজ সতেজ হয়ে ওঠে। অনুররূপভাবে, মহানবী মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবে অন্তরসমূহে উত্তাপ, মস্তিষ্কের নতুন উদ্যমতা এবং মাথায় নতুন উদ্দীপনা প্রবিষ্ট হলো, লক্ষ-কোটি মানুষ নিজেদের প্রকৃত মনযিলের সন্ধানে ও সেখানে পৌছার জন্য বেরিয়ে পড়ল।

প্রত্যেক রাষ্ট ও জাতির প্রবৃত্তিতে এটাই নেশা এবং প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে এর প্রতিযোগিতার উদ্দীপনা দৃষ্টিগোচর হলো, পাল্টে গেল মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি। আরব, আজম, মিসর, তুরস্ক, ইরান, খোরাসান, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, অবশেষে আমাদের দেশ হিন্দুস্থান ও পূর্ব হিন্দুস্থানের সবাই এই জগতের ইশক-মহব্বত ও প্রেম-ভালবাসায় হয়ে পড়লো বেকারার ও দেওয়ানা। মানবতা যেন শত শত বছরের দীর্ঘ ও গভীর ঘুম শেষে চোখ মেলে তাকাল, অতঃপর তারা ঘুমের কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নিতে চাইল ফলে মানবতার প্রতিটি গোষ্ঠী থেকে জন্ম নিলেন,আল্লাহ্‌র পথের অসংখ্য দাঈ, আল্লাহ্-প্রেমিক ও আল্লাহ্-সন্ধানী দুঃসাহসী আবেদ-কামিল, মাখলুকের ব্যাথায় ব্যতিত, মানবতার কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ এবং আরো এমন সব মনীষী ও ব্যক্তিত্ব, নূরের ফেরেশতাকুলের কাছেও যাঁরা ঈর্ষার কারণ, তাঁরা সবাই মিলে কী করলেন?

তাঁরা বিরান ও অনাবাদ হৃদয়গুলোকে আবাদ করলেন, আল্লাহ্-প্রেমের মশাল জ্বেলে বইয়ে দিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও হিকমত-মারেফাতের হাজারো সালসাবিল; নির্যাতিত মানুষের হৃদয়ে স্থাপন করলেন জুলুম-নিপীড়ন, অন্যায়-অবিচার এবং দুশমনী ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক প্রচণ্ড দ্রোহ, নির্যাতিত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত মানবতাকে শিক্ষা দিলেন সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব আর উপেক্ষিত, বিতাড়িত ও অসহায় মানবগোষ্ঠীকে টেনে নিলেন সেই বুকে যা আবাদ হয়ে আছে শুধু প্রেম, ভালবাসা ও মায়া মমতায় মনে হয় যেন বৃষ্টির ফোটার ন্যায় যমীনের প্রতিটি আনাচে কানাচে তারা অবতরণ করেছেন– যা গণনা করা অসম্ভব।

এঁদের সংখ্যার কথা বাদ দিয়ে এঁদের গুণও দেখুন। তাঁদের উন্নত চিন্তা, জাগ্রত বিবেকবোধ, প্রশান্ত আত্মা, তীক্ষ্ণধী ও নির্মল স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে পাঠ করুন। কেমন করে এঁরা আর্ত মানবতার ব্যথায় ব্যথিত হতেন এবং নিজেকে তাদের সেবায় বিলিয়ে দিতেন। সৃষ্টিলোকের দুঃখ-দুর্দশায় তাঁদের পবিত্র আত্মাগুলো কিভাবে বিগলিত হতো সমবেদনায়, সহমর্মিতায়। মানবতার মুক্তির স্বার্থে নিজেদেরকে কিভাবে তাঁরা যে কোন ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিতেন হাসিমুখে আর নিজেদের সন্তান ও সংশ্লিষ্টদেরকেও চরম পরীক্ষার মুখে ঠেলে দিতেন। তাদের আমীর ও শাসকগণ ছিলেন কতটা পূর্ণ দায়িত্বসচেতন ও আমানতদার এবং তাদের প্রজাসাধারণ তাদের আনুগত্যে কতটা উদ্বুদ্ধ ছিল। তাদের ইবাদতের উৎসাহ, তাদের প্রার্থনার শক্তি, তাদের অধ্যাবসায় ও দারিদ্র্য-সেবার উদ্দীপনা এবং উন্নত চরিত্রের ঘটনাবলী পাঠ করুন। প্রবৃত্তির পথে তাদের শুচি, আত্মসমালোচনা, দূর্বলদের প্রতি করুণা, বন্ধুবাৎসল্য, শত্রুর প্রতি কৃপা এবং সহানুভূতি সৃষ্টির নমুনা দেখুন। অনেক সময় কবি-সাহিত্যিকের কল্পনা বিলাসও এতটা উচ্চতায় পৌঁছতে পারেনি- যেখানে তাঁরা স্বকৃতিসহ দৈহিকভাবে উপনীত হয়েছেন। যদি ইতিহাসের সনদযুক্ত ও ধারাবাহিক সাক্ষ্য না থাকত, তা হলে এ ঘটনাগুলো কিসসা-কাহিনী ও রূপক বলেই মনে হতো। এ মহাবিপ্লব মুহাম্মদ রাসূল (সা)-এর বিশাল মু'জিযা ও তাঁর রাহমাতুল্লিল 'আলামিন হওয়ারই কারিশমাঁ।

আখলাক ও নীতি-নৈতিকতা

রাসূলুল্লাহ (সা) কেমন ছিলেন

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উন্নত চরিত্র ও ব্যবহার, মহান গুণাবলী ও আচার-অভ্যাস সম্পর্কে উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা)-এর সন্তান এবং হযরত হাসান ও হুসায়নের মামা হিন্দ ইবন আবী হালা (রা) খুবই ব্যাপক ও বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা দান করেছেন। তিনি বলেন :

"রাসূলুল্লাহ (সা) সবসময় আখিরাতের চিন্তায় ও পারলৌকিক বিষয় নিয়ে চিন্তামগ্ন থাকতেন। এক্ষেত্রে তাঁর একটি ধারাবাহিকতা ছিল। এ চিন্তা তাঁকে সবসময় অস্থির করে রাখত। অধিকাংশ সময় তিনি দীর্ঘ নীরবতা পালন করতেন, বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। কথা বলতে শুরু করলে বেশ ভালভাবে উচ্চারণ করতেন[১] এবং সেভাবেই শেষ করতেন। তাঁর আলোচনা ও বর্ণনা খুব পরিষ্কার, স্পষ্ট ও দু'রকম অর্থ থেকে মুক্ত হতো। কথা অনাবশ্যক-ভাবে যেমন দীর্ঘ হতো না, তেমনি তা খুব সংক্ষিপ্তও হতো না (বরং পরিমাণ মতো হতো)। তিনি নরম মেজাজের ও নম্রভাষী ছিলেন, কর্কশ ও রূঢ়ভাষী ছিলেন না।

তিনি কাউকে যেমন ঘৃণা কিংবা অবজ্ঞা করতেন না, তেমনি কেউ তাঁকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করুক তাও পছন্দ করতেন না। অর্থাৎ তিনি দুর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন না যে, সবকিছুই মেনে নেবেন, বরং প্রভাবশালী মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। নিয়ামতের বিরাট কদর করতেন এবং খুব বেশি মনে করতেন, পরিমাণে তা যত অল্পই হোক না কেন, এমনকি তা চোখে না পড়ার মত বিষয়ও যদি হয়, এবং এর ত্রুটি বা খুঁত ধরতেন না। খানাপিনার বস্তুর দোষ ধরতেন না যেমন, তেমনি প্রশংসাও করতেন না। পার্থিব ও পার্থিব বিষয় সম্পর্কিত কোন বিষয়ের উপর রাগান্বিত হতেন না। কিন্তু আল্লাহ্‌র কোন হক নষ্ট হতে দেখলে সে সময় তাঁর জালালী তথা তেজস্বিতার সামনে কোন কিছুই দাঁড়াতে পারত না, যতক্ষণ না তিনি এর বদলা নিতেন।

---

১. অর্থাৎ অহংকারীর মত বেপরোয়া ও উদ্ধত ভঙ্গিতে কাঠখোট্টা কথা বলতেন না।

তিনি নিজের ব্যাপারে কখনও ক্রুদ্ধ হননি এবং কারো থেকে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। ইশারা করতে হলে গোটা হাত দ্বারা ইশারা করবেন। কোন বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতে হলে একে উল্টে দিতেন। কথা বলার সময় ডান হাতের তালুকে বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুলের সাথে মিলাতেন। রাগের কিংবা অপছন্দনীয় কথা হলে শ্রোতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। খুশি হলে চোখ নামিয়ে ফেলতেন। তাঁর হাসি বেশির ভাগ সময় মুচকি হাসি হতো– যার ফলে বৃষ্টিস্নাত মেঘের আড়াল থেকে সূর্য উঁকি দেবার মত উজ্জ্বল শুভ্র দাঁতগুলো দেখা যেত।"

হযরত আলী (রা) ছিলেন তাঁর খান্দানেরই লোক। তিনি লেখাপড়া ও জানাশোনার ব্যাপক সুযোগ পেয়েছিলেন এবং যার দৃষ্টি মানুষের মনস্তত্ত্ব ও চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোর গভীরে প্রবেশ করেছিল। তিনি ছিলেন নবীজীর (সা) একান্ত নিকটজন ও কাছের মানুষ। একই সাথে মানুষের গুণাবলী প্রকাশে ও দৃশ্য বর্ণনায় তিনি ছিলেন সবচেয়ে দক্ষ। তাঁর মহান চরিত্র (خُلُقٌ عَظِيْمٌ) সম্পর্কে তিনি বলেন :

"তিনি স্বভাবগতভাবেই খারাপ কথা বলা, নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা থেকে দূরে অবস্থান করতেন এবং অনিচ্ছাকৃতভাবেও এমন কোনও বিষয় তাঁর থেকে প্রকাশ পেত না। বাজারে তিনি কখনও উচ্চস্বরে কথা বলেননি। মন্দের বদলা কখনো মন্দের দ্বারা নিতেন না, বরং ক্ষমা করতেন। তিনি কখনো কারো উপর হাত তোলেননি। একমাত্র 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' ছাড়া। কখনো কোন খাদেম কিংবা মহিলার উপর হাত তোলেননি। কোন প্রকার জুলুম কিংবা বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ নিতে তাঁকে কেউ কখনো দেখেনি– যতক্ষণ না কেউ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত হুদূদ বা সীমারেখা অতিক্রম করত এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদার উপর আঁচ পড়ত। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলার কোন হুকুম নষ্ট করা হলে এবং তাঁর মর্যাদার উপর আঘাত এলে তিনি এর জন্য সবচেয়ে বেশি রাগান্বিত হতেন। দু'টি জিনিস সামনে এলে সহজতরটিকে বেছে নিতেন। যখন নিজের ঘরে তাশরীফ নিতেন, তখন সাধারণ মানুষের মতই দেখা যেত। নিজেই কাপড় পরিষ্কার করতেন, বকরির দুধ দোহন করতেন এবং নিজের সকল প্রয়োজন নিজেই আঞ্জাম দিতেন।

নিজের যবান হিফাযত করতেন। কেবল তখনই মুখ খুলতেন, যখন এর প্রয়োজন দেখা দিত। লোকের মন জয় করতেন, তাদের মনকে ঘৃণাসিক্ত করতেন না। কোন সম্প্রদায় কিংবা জাতি-গোষ্ঠীর সম্মানিত লোকের আগমন

ঘটলে, তিনি তার সঙ্গে সম্মান ও মর্যাদামণ্ডিত আচরণ করতেন এবং তাঁকে তাঁর জাতীয় আমির বানিয়ে দিতেন। লোকের সম্পর্কে সতর্ক ও পরিমিত মন্তব্য করতেন আপন হৃদ্যতা ও আখলাক দ্বারা মাহরূম না করেই। আপন সঙ্গী-সাথীদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন।

তিনি ভাল কথার ভাল দিক বর্ণনা করতেন এবং একে শক্তি জোগাতেন মন্দ কথার অনিষ্টকর দিক বলে দিতেন এবং একে দুর্বল করে দিতেন। তাঁর ব্যাপারগুলো ছিল ভারসাম্যময় ও একই রূপ। এক্ষেত্রে, কোনরূপ পরিবর্তন হতো না। কোনকিছুর প্রতি অলসতা কিংবা অবহেলা প্রদর্শন করতেন না এই ভয়ে যে, না জানি অন্যেরাও এই অলসতার শিকার হয়ে পড়ে এবং বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ে। প্রতিটি অবস্থা ও প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যই তাঁর নিকট সেই অবস্থামাফিক প্রয়োজনীয় সামান ছিল। সত্যের ব্যাপারে তিনি কোনরূপ কার্পণ্যের প্রশ্রয় দিতেন না, আবার সীমা অতিক্রমও করতেন না। যেসব লোক তাঁর কাছাকাছি থাকতেন, তাঁরা হতেন সবচেয়ে ভাল ও নির্বাচিত লোক। তাঁর চোখে সর্বোত্তম লোক তিনি ছিলেন– যিনি সকলের মঙ্গলকামী এবং যাঁর ব্যবহার ভাল।

তার নিকট সবচেয়ে বেশি সম্মান ও মর্যদার অধিকারী ছিলেন তিনি– যিনি মানুষের শোকে সান্ত্বনাদানকারী, সহানুভূতিশীল এবং যিনি অপরের সাহায্য-সহযোগিতায় সকলের আগে থাকেন। আল্লাহ্‌র যিকির করতে করতে তিনি দাঁড়াতেন এবং আল্লাহ্‌র যিকির করতে করতে বসতেন। তিনি কোথাও তাশরীফ নিলে যেখানে মজলিস সমাপ্ত হত, সেখানেই অবস্থান করতেন এজন্য আদেশও করতেন। মজলিসে উপস্থিত সবার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতেন এবং সকলের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। উপস্থিত সকলে মনে করতেন হযরত (সা)-এর চোখে তার চেয়ে বেশি আপন বুঝি আর কেউ নন। যদি কেউ কোন বিশেষ প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যে রাসূল (সা)-কে বসাতেন কিংবা কোন প্রয়োজনে কথা বলতেন, তবে তিনি পরিপূর্ণ ধৈর্য্য এবং প্রশান্তির সঙ্গে তার সকল কথা শুনতেন যতক্ষণ না সে তার কথা শেষ করে নিজে থেকে বিদায় নিত। যদি কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইতো, সাহায্য কামনা করত, তবে তিনি তার প্রয়োজন পূরণ না করে ফিরিয়ে দিতেন না, কিছু দিতে না পারলেও কমপক্ষে তাকে মিষ্টি ও কোমল ভাষায় জবাব দিতেন। তাঁর উত্তম ব্যবহার সবার জন্যই উন্মুক্ত ছিল এবং তিনি তাদের জন্য পিতার ভূমিকা পালন করতেন। সকল শ্রেণীর ও সকল স্তরের লোক সত্যের মাপকাঠিতে তাঁর চোখে ছিল সমান।

তাঁর মজলিস ইলম ও মা'রেফাত, লজ্জা-শরম, ধৈর্য্য ও আমানতদারীর মজলিস ছিল। এ মজলিসে কেউ উচ্চকণ্ঠে কথা বলত না, কারো দোষ-ত্রুটির চর্চা কিংবা চরিত্র হননও করা হত না এ মজলিসে। কারো সম্মান ও মর্যাদার উপর আঘাত হানা হতো না কিংবা কারো চারিত্রিক দুর্বলতাকে ঢোল পিটিয়ে প্রচারও করা হতো না। সকলেই ছিল সমান, কারো উপর কারো মর্যাদা থাকলে, তা একমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতেই ছিল। ছোটরা বড়দের সম্মান করত আর বড়রা ছোটদের করতেন স্নেহ ও মায়া। অভাবী ও দুঃস্থ লোকদেরকে নিজের উপর প্রাধান্য দিতেন। মুসাফির ও নবাগতকে হিফাযত করতেন এবং তাদের প্রতি খেয়াল রাখতেন।"

হযরত আলী (রা) আরো বলেন :

"তিনি সব সময় হাসিখুশি ও প্রফুল্ল থাকতেন। তিনি ছিলেন কোমল চরিত্রের ও নরম দিলের মানুষ। তিনি কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন না, রূঢ় ও কঠোর ভাষায় কথা বলায় অভ্যস্ত ছিলেন না, মানুষের উপর খুব সত্বর সদয় হয়ে যেতেন, খুব তাড়াতাড়ি মানুষকে ক্ষমা করে দিতেন, কারো সঙ্গে ঝগড়া করতেন না, বরং পরিপূর্ণ ভাব-গম্ভীর, শান্ত ও ধীরস্থির মেজাজের ছিলেন। তিনি চেঁচিয়ে কথা বলতেন না, কোনো ধরনের ফালতু কথা বলতেন না আর নিম্নমানের কথাও বলতেন না, কারো উপর দোষ চাপাতেন না, সংকীর্ণ চিত্ত ও কৃপণ ছিলেন না। যে কথা তাঁর পছন্দ হত না, তা তিনি উপেক্ষা করতেন, তা ধর্তব্যের মধ্যে আনতেন না, স্পষ্টভাবে সে সম্পর্কে হতাশা প্রকাশ করতেন না এবং এর জওয়াবও দিতেন না।

"তিনটি জিনিসের স্পর্শ থেকে তিনি নিজকে সম্পূর্ণ বাঁচিয়ে রাখতেন–

১। ঝগড়া, ২। অহংকার ও ৩। অনর্থক কথা ও কাজ। লোকদেরকেও তিনটি জিনিসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন : ১। কারো ওপর দোষ চাপাতেন না, ২। কারো দুর্বল ও গোপনীয় বিষয়ের অনুসন্ধান করে বেড়াতেন না এবং ৩। কেবল সে কথাই বলতেন– যে কথাতে সওয়াবের আশা করা যেত। যখন কথা বলতেন, মজলিসে উপস্থিত লোকেরা সম্মানার্থে এমনভাবে মস্তক অবনত করে ফেলতেন যেন মনে হত বুঝি সকলের মাথার উপর পাখি বসে আছে, না জানি নড়াচড়াতেও তা উড়ে যায়। যখন তিনি চুপ করতেন, তখন তারা কথা বলতেন। তাঁর সামনে তারা কখনো ঝগড়ায় লিপ্ত হতেন না। যদি তাঁর মজলিসে কেউ কথা বলতেন, তখন আর সব লোক চুপ করে ঐ ব্যক্তির কথা শুনতেন, যতক্ষণ না তিনি তার কথা শেষ করতেন।

রাসূল (সা)-এর সামনে প্রত্যেক লোকের কথা বলার অধিকার ঠিক ততটুকুই থাকত, যতটুকু থাকত তার পূর্ববর্তী লোকের যাতে সে পূর্ণ সন্তুষ্টি সহকারে তার কথা বলার সুযোগ পায় এবং ঠিক তেমনি সম্মান ও প্রশান্তির সঙ্গে তা শোনা হতো। যে কথায় সকলে হাসত, তিনিও তাতে হাসতেন। যে কথায় লোকে বিস্ময় প্রকাশ করত, তিনিও তাতে বিস্ময় প্রকাশ করতেন। মুসাফির ও পরদেশীর বেআদবী তিনি সইতেন এবং সর্বপ্রকার দাবী, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে শুনতেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) এ ধরনের লোকদের মনোযোগ নিজেদের দিকে টেনে নিতেন যাতে রাসূল (সা)-এর ওপর তা বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। তিনি বলতেন : তোমরা অভাবী ও প্রয়োজন মুখাপেক্ষী লোক পেলে তাদের সাহায্য করবে। তিনি সেইসব লোকের প্রশংসা ও স্তুতি কবূল করতেন– যারা সীমার ভেতর অবস্থান করত। কারো কথা বলার সময় তিনি কথা বলতেন না, তার কথা মাঝপথে থামিয়েও দিতেন না। তবে হ্যাঁ, সীমা অতিক্রম করলে তাকে নিষেধ করতেন এবং মজলিস থেকে উঠে গিয়ে তার কথা থামিয়ে দিতেন।

তিনি সবচেয়ে উদার মন ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন; স্পষ্টভাষী, কোমল প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং সামাজিক, পারস্পরিক লেনদেনের ব্যাপারে বদান্য ছিলেন। যে তাঁকে প্রথম দেখত, সে-ই ভীত ও কম্পিত হয়ে পড়ত। কিন্তু তাঁর সাহচর্যে থাকলে ও জানাশোনা হলে মুগ্ধ, আকৃষ্ট ও অভিভূত হতো এবং যেই তাঁকে দেখত, সেই বলত, তাঁর মত আর কাউকে আগে যেমন দেখিনি, তেমনি দেখিনি এরপরও অন্য কাউকে। আমাদের নবী (সা)-এর উপর আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহরাশি বর্ষিত হোক।"[১]

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার পোশাকে মণ্ডিত ও সজ্জিত করেছিলেন এবং তাঁকে ভালবাসা ও আকর্ষণ, ভীতিকর প্রভাব ও ব্যক্তিত্বের এক অপূর্ব প্রতিমূর্তি বানিয়েছিলেন। হিন্দ ইবন আবী হালা (রা) বলেন :

"তিনি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা ও শান-শওকতের অধিকারী ছিলেন এবং অন্যের দৃষ্টিতেও খুবই মর্যাদাবান ছিলেন। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মতই জ্বলজ্বল করত।"[২]

---

১. শামাইলে তিরমিযী থেকে উদ্ধৃত

২. প্রাগুক্ত, হিন্দ ইবন আবী হালা (রা)-এর সূত্রে হাসান (রা) কর্তৃক বর্ণিত

হযরত বারা' ইবন আযিব (রা) বলেন :

"আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) মধ্যম আকৃতির ছিলেন, না বেশি লম্বা, না বেশি বেঁটে। আমি একবার তাঁকে লাল কুবা পরিহিত অবস্থায় দেখেছিলাম। এর থেকে ভাল কোন জিনিস আমি কখনো দেখিনি।"[১]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন :

"তিনি মধ্যম আকৃতির ছিলেন, বরং এর থেকে কিছুটা লম্বা। তিনি ছিলেন গৌরবর্ণের, ঘন কৃষ্ণ শ্মশ্রু, মুখমণ্ডল অত্যন্ত মানানসই ও সুন্দর, দীর্ঘ চোখের পলক ও চওড়া কাঁধের অধিকারী। শেষে তিনি বলেন, তাঁর মত আর কাউকে এর আগেও যেমনি দেখিনি, তেমনি দেখিনি পরেও।"[২]

হযরত আনাস (রা) বলেন : "আমি রেশম ও রেশমী কিংখাবও তাঁর হাতের মত নরম পাইনি এবং তাঁর (শরীরের) খোশবু থেকে অধিকতর খোশবুও আমি আর শুঁকিনি।"[৩]

আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে রিসালাত দ্বারা ধন্য করেছিলেন, তাঁকে আপন মাহবূব বানিয়েছিলেন এবং উত্তম মনোনয়নে মনোনীত করেছিলেন। তাঁর অগ্র-পশ্চাতের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি ইবাদত-বন্দেগীতে সবচেয়ে বেশি উদ্যমী ও প্রয়াসী ছিলেন, ছিলেন সবচেয়ে আগ্রহী।

হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বলেন :

"একবার রাসূলুল্লাহ (সা) নফল নামাযে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন যে, তাঁর কদম মুবারক ফুলে গিয়েছিল। আরয করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার আগে-পিছের যাবতীয় গুনাহ তো মাফ করে দেয়া হয়েছে (তারপরও ইবাদতে এত বেশি কষ্ট করছেন কেন)? একথা শুনে তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহ্‌র শোকরগুযার বান্দা হব না?"[৪]

---

১. বুখারী-মুসলিম
২. আল-আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারীকৃত
৩. বুখারী ও মুসলিম; বুখারী, কিতাবুল মানাকিব
৪. ইমাম বুখারী সূরা আল-ফাতিহার তাফসীরে এবং মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ ইহয়া উল্লায়ল অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : "রাসূলুল্লাহ (সা) একবার কুরআন পাকের একটি আয়াত তিলাওয়াত করতে করতে সারা রাত কাটিয়ে দিয়েছিলেন।"[১]

হযরত আবূ যর (রা) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের বেলায় সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে একটি আয়াত তিলাওয়াত করতে করতে ভোর হয়ে যায়। আয়াতটি ছিল :

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

"আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে, তারা তো আপনারই বান্দা। আর আপনি তাদের ক্ষমা করলে আপনি তো অবশ্যই প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২] [সূরা মায়িদা : ১১৮]

হযরত আয়েশা (রা) এও বলেন : "তিনি এত বেশি সিয়াম (রোযা) পালন করতেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি সম্ভবত সিয়াম আর ছাড়বেন না সর্বদাই বুঝি রোযাদার থাকবেন। আবার যখন সওম ছাড়তেন, তখন আমরা ভাবতাম সম্ভবত তিনি আর সিয়াম পালন করবেন না।"[৩]

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন : "যদি কেউ তাঁকে কিয়ামুল-লায়ল (তাহাজ্জুদ সালাত)-এ মশগুল দেখতে চাইত, তবে তা দেখতে পেত। আবার ঠিক তেমনি কেউ যদি তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইত, তাহলে তাও সে দেখতে পেত।"[৪]

আব্দুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর (রা) বর্ণনা করেন : "আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে দেখতে পেলাম, তিনি সালাতে মগ্ন এবং কান্নার কারণে তার বক্ষ মুবারক থেকে এমন আওয়াজ বের হচ্ছিল যেমন ডেকচি থেকে ফুটন্ত পানির শব্দ বের হয়।"[৫]

সালাত ভিন্ন আর কোনকিছুতে তিনি সান্ত্বনা লাভ করতেন না এবং মনে হতো, সালাত আদায়ের পরও তিনি সালাতের জন্য অপেক্ষমান ও আকাঙ্ক্ষী। তিনি বলতেন : جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ "আমার চক্ষুর শীতলতা সালাতের ভেতর রাখা হয়েছে।"[৬]

---

১. তিরমিযী
২. নাসাঈ ও ইবন মাজাহ
৩. নফল সিয়াম সম্পর্কে বলা হয়েছে।
৪. বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ
৫. শামাইলে তিরমিযী
৬. নাসাঈ, হাক্কুন নিসা অধ্যায়

সাহাবা-ই কিরাম (রা) বলেন[১] : "যখনই রাতের বেলা প্রবল বেগে বাতাস বইত, তিনি মসজিদে আশ্রয় নিতেন, যতক্ষণ না বাতাস থেমে যেত। যদি মহাকাশে কোন রকম পরিবর্তন দেখা যেত, যেমন সূর্যগ্রহণ কিংবা চন্দ্রগ্রহণ, তিনি সালাতে মনোনিবেশ করতেন, এ থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন যতক্ষণ না গ্রহণ কেটে যেত এবং আকাশ পরিষ্কার হয়ে যেত।"[২]

তিনি সব সময় সালাত আদায়ে আগ্রহী থাকতেন এবং সালাত ছাড়া তৃপ্তি ও শান্তি পেতেন না। যতক্ষণ না তিনি সালাত আদায় করতেন তাঁর অস্থিরতা বিদ্যমান থাকত। কখনো বা তাঁর মুয়ায্‌যিন বিলাল (রা)-কে বলতেন, "ওহে বিলাল! সালাতের ইন্তিজাম কর এবং আমার শান্তি ও তৃপ্তির ব্যবস্থা কর।"[৩]

পার্থিব সম্পদ ও এর প্রতি অনীহা

টাকা-পয়সা ও দুনিয়ার ধন-সম্পদ রাসূল (সা) কোন নজরে দেখতেন তা কোন কথাশিল্পী কিংবা তুখোড় কোন বাগ্মীও বর্ণনা করতে গেলে খেই হারিয়ে ফেলবেন। আর তা এজন্য যে, তিনি তো দূরের কথা, তাঁর ঈমানী ও রব্বানী মাদ্‌রাসার একজন পিছনের সারির ছাত্র এবং আরব ও অনারব বিশ্বের একজন ছাত্রের ছাত্র ও টাকা-পয়সা কিংবা বিত্ত-সম্পদকে এক কানাকড়ির বেশি মূল্য দিতেন না এবং তাদের বৈরাগ্যসুলভ জীবন পার্থিব সম্পদের প্রতি নিস্পৃহ মানসিকতা, অপরের জন্য সম্পদ ব্যয়ের আগ্রহ, নিজের মোকাবিলায় অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্যদান, অল্পে তুষ্টি ও পরমুখাপেক্ষিতাহীনতার যেসব ঘটনা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাওয়া যায়, তাতে যে কোন মানুষের হতভম্ব হওয়া বিচিত্র নয়![৪] যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একজন গোলামদের গোলামের এই অবস্থা, তখন এ থেকেই পরিমাপ করা যায় তাহলে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা), যিনি এদের সবার ইমাম ও পথপ্রদর্শক এবং যিনি প্রতিটি নেক ও কল্যাণ, মর্যাদা ও তাকওয়ায় তাদের মুরব্বী ও শিক্ষক ছিলেন, তাঁর অবস্থা এ ব্যাপারে কী হতে পারে?

---

১. "যখন কোন সমস্যা, সংকট কিংবা পেরেশানীর কারণ দেখা দিত, অমনি তিনি সালাতের দিকে মনোযোগী হতেন এবং সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন।-আবূ দাউদ

২. তাবারানী।

৩. আবূ দাউদ, ফী সালাতিল আতামাহ

৪. বিস্তারিত জানতে পাঠ করুন– আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের কিতাবুয যুহদ; ইবনুল যাওজীর কিতাবুস সফওয়া ও আবূ নুআয়ম-এর হিলয়াতুল আউলিয়া।

এজন্য আমরা এখানে এ সম্পর্কে মাত্র কয়েকটি বর্ণনা তুলে ধরছি– যা সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর মুখ থেকে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। কেননা সত্য ঘটনা থেকে বেশি প্রভাবশালী ও কার্যকর কোনকিছু নেই এবং এর চেয়ে অধিকতর বিশুদ্ধ ও নির্ভুল প্রতিনিধিত্ব কোন কথামালা দ্বারা হতে পারে না।

তাঁর সবচেয়ে প্রভাবমণ্ডিত ও বিখ্যাত উক্তি, যা তিনি হরফে হরফে মেনে চলতেন এবং যা ছিল তাঁর সমগ্র জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, তা হলো :

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ

"হে আল্লাহ্! পারলৌকিক জীবনই তো আসল জীবন।"

তিনি বলতেন :

مَالِيْ وَلِلدُّنْيَا وَمَا اَنَا وَالدُّنْيَا اِلَّا كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.

"দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক কি? দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক তো এতটুকুই যেমন কোন মুসাফির পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে কোন গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বসল, আরাম করল, তারপর ছায়া ছেড়ে গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হলো।"[১]

হযরত উমর (রা) একবার নবীজী (সা)-কে চাটাইয়ের উপর শোয়া অবস্থায় দেখতে পান। দেখতে পান তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ। এই দৃশ্যে হযরত উমর (রা) কেঁদে ফেলেন তাঁকে কাঁদতে দেখে রাসুলে আকরাম (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার?

উমর (রা) আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র সৃষ্টজগতের ভিতর সর্বাধিক নির্বাচিত আপনি, অথচ সকল সুখ-সম্ভোগের অধিকারী রোম ও পারস্য সম্রাটেরা!" এ কথা শুনে রাসুল আকরাম (সা)-এর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, "হে খাত্তাব পুত্র! এতে কি তোমার কোন সন্দেহ আছে?" এরপর তিনি বললেন, "এরা তো তারাই, যাদেরকে দুনিয়ার জীবনের সমস্ত মজাই এখানে দিয়ে দেয়া হয়েছে।"[২]

তিনি কেবল বিলাসী ও আরাম-আয়েশের জীবন নিজের জন্যই অপছন্দ করতেন তাই নয়, বরং আহলে বায়ত (নবী-পরিবার)-এর জন্যও এর পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি দু'আ করতেন :

---

১. আবূ দাউদ; আত তিরমিযী
২. বুখারী-মুসলিম

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا۔

"হে আল্লাহ্! মুহাম্মদের পরিবারবর্গের যতটুকু প্রয়োজন, কেবল ততটুকু রিযিকই দিও।"[১]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন : "শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আবূ হুরায়রার জীবন! আল্লাহ্র নবী ও তাঁর পরিবারবর্গ কখনো গমের রুটি পরপর তিনদিন পেটভরে খেতে পারেন নি। আর এ অবস্থায় তাঁরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন।"

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন : "আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর পরিবারবর্গের এক চাঁদ উঠে আর এক চাঁদ এসে যেত, অথচ আমাদের ঘরে চুলা জ্বলত না, কেবল খেজুর ও পানির উপর আমাদের জীবন চলত।"[২]

যখন তিনি জীবনের শেষ হজ্জ আদায় করেন, যে সময় তাঁর সামনে ছিল মুসলমানদের জনসমুদ্র, সমগ্র আরব ভূখণ্ড ছিল তাঁর পদানত, অথচ তাঁর নিজের অবস্থা ছিল একজন দরিদ্রের মতো, তাঁর গায়ে ছিল একটি চাদরমাত্র যার মূল্য চার দিরহামের বেশি ছিল না। সে সময় তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহ্! একে তুমি এমন এক হজ্জ বানাও যার ভিতর রিয়া (লোক দেখানো) ও খ্যাতির কামনা না থাকে।"[৩]

হযরত আবূ যর (রা)-কে তিনি বলেছিলেন : "আমি পছন্দ করি না, আমার কাছে ওহুদ পাহাড়সম স্বর্ণ থাকুক আর-এ অবস্থায় তিনদিন অতিবাহিত হোক এবং তার ভেতর থেকে একটি দীনারও অবশিষ্ট থাকুক। তবে কোন দ্বীনী কাজে কিছু অবশিষ্ট থাকলে ভিন্ন কথা। অন্যথায়, আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে আমি সেগুলো এভাবে এবং এভাবে ডানে বামে ও পেছনে (যাকে পাব) বিলিয়ে দেব।"[৪]

হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, "কখনো এমন হয়নি, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে কোন জিনিস চাওয়া হয়েছে আর তার জওয়াবে তিনি

---

১. বুখারী কিতাবুর রিকাক, মুসলিম কিতাবুয-যুহদ
২. বুখারী ও মুসলিম
৩. শামাইলে তিরমিযী, আনাস (রা) বর্ণিত
৪. বুখারী ও মুসলিম, শব্দসমষ্টি বুখারীর, কিতাবুর রিকাক
باب قول النبى (صـ) ما احب الالى احدا ذهبا۔

'না' বলেছেন।[১] ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত : "রাসূলুল্লাহ (সা) বদান্যতা ও দানশীলতায় বেগবান বাতাসের চেয়েও অধিক দ্রুতগামী ছিলেন।"[২]

হযরত আনাস (রা) বলেন : একবার এক লোক তাঁর (রাসূলের) নিকট কিছু চাইল। তিনি তাকে একপাল বকরি ও ভেড়া দিয়ে দিলেন, যা দু'টো পাহাড়ের মাঝে ছিল। লোকটি ভেড়া-বকরির পাল হাঁকিয়ে তার গোত্রের লোকদের নিকট ফিরে গেল এবং বলতে লাগল, লোক সকল! ইসলাম কবূল কর। মুহাম্মদ (সা) এভাবে বিলাচ্ছেন যে, দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের কোনই ভয় নেই।

একবার তাঁর খিদমতে নব্বই হাজার দিরহাম পেশ করা হলো। দিরহামগুলো একটা চাটাইয়ে ঢালা হলো। অতঃপর তিনি তা দাঁড়িয়ে বণ্টন শুরু করলেন, কোন প্রার্থীকেই তিনি ফেরাননি। এমনকি এক সময় তা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেল।[৩]

আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের সঙ্গে আচরণ

কিন্তু ইবাদতের প্রতি এই আগ্রহ, দুনিয়া ও পার্থিব জগতের উপকরণাদির সঙ্গে সম্পর্কহীনতা, পরিপূর্ণ যুহদ, আল্লাহ্ তা'আলার দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ এবং তাঁর দরবারে কান্নাকাটি, দু'আ ও মুনাজাতের ভেতর দিয়ে আত্মবিলোপ, তাঁর সবচেয়ে উত্তম আখলাক, স্নেহ-ভালবাসা, অন্তররাজ্য জয়, স্নেহপূর্ণ আচরণ এবং প্রত্যেক মানুষকে তার বৈধ অধিকার প্রদানে ও তার সম্মান ও মর্যাদামাফিক আচরণে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করত না। আর এ দু'টো এমন বিষয় যে, দুটোকে একত্র করা অন্য কোন লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি বলতেন :

لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا۔

"আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তবে খুব কম হাসতে আর বেশি কাঁদতে।"[৪]

লোকের ভিতর তিনিই সবচেয়ে উদার হৃদয়ের ছিলেন, কোমল প্রকৃতির অধিকারী এবং খান্দানের দিক দিয়ে সর্বাধিক সম্মানিত ছিলেন। তদপুরি তিনি সাহাবায়ে কিরাম (রা) থেকে আলাদা হয়ে থাকতেন না, বরং তাঁদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন, তাঁদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে

---

১. বুখারী, কিতাবুল-আদাব
২. পূর্ণ হাদীস, বুখারী ও মুসলিম-এ দেখা যেতে পারে।
৩. বুখারী ও মুসলিম
৪. আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণিত

আনন্দিত চিত্তে ও সহাস্য বদনে মিশতেন। তাঁদের বাচ্চাদের কোলে বসাতেন। স্বাধীন হোক বা ক্রীতদাস-দাসী, ফকীর-মিসকীন, সকলের দাওয়াতই তিনি কবূল করতেন। পীড়িতদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন, তা সে শহরের শেষ প্রান্তেই থাকুক না কেন! মা'যূর-এর ওযর কবূল করতেন। 'সাহাবা-ই কিরাম (রা)-এর মজলিসে তাঁকে কখনো হাত-পা ছড়িয়ে বসতে দেখা যায়নি, যাতে অন্যের কোনরূপ কষ্ট হয়।

'আবদুল্লাহ ইবনুল-হারিছ (রা) বর্ণনা করেন : "আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেয়ে বেশি প্রফুল্ল ও হাসি-খুশি আর কাউকে দেখিনি।"[১]

জাবর ইবন সামুরা (রা) বর্ণনা করেন : "রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুবারক মজলিসে আমি শতবারের বেশি বসার সুযোগ পেয়েছি। আমি দেখেছি, তাঁর সাহাবা-ই কিরাম (রা) একে অন্যের থেকে কবিতা শুনছেন, শোনাচ্ছেন এবং জাহিলী যুগের কোন কথা ও ঘটনাসমূহের আলোচনাও করছেন আর তিনি চুপ করে আছেন অথবা কখনো কোন হাসির কথা হলে তিনিও তাঁদের সাথে মুচকি হাসছেন।"

মুরায়েদ (রা) বর্ণনা করেন : "রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে উমাইয়া ইবনুস সালত-এর কবিতা শোনাবার জন্য বললেন। তারপর আমি তাঁকে তার কবিতা শোনালাম।"[২]

তিনি অত্যন্ত কোমল অন্তঃকরণবিশিষ্ট, স্নেহ-ভালবাসা ও দয়ামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি ছিলেন। মানবীয় আবেগ ও সূক্ষ্মতার অনুভূতি তাঁর পবিত্র জীবনচরিতে সর্বোত্তম ও সুন্দরতম আকৃতিতে ছেঁয়েছিল।

আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা)-কে বলতেন, আমার সন্তানদ্বয় (হাসান ও হুসায়ন)-কে ডাক দাও। ডাক দিতেই তাঁরা দৌড়ে আসতেন। তখন তিনি তাঁদের দু'জনকে চুমু খেতেন এবং টেনে নিতেন। একবার তিনি তাঁর দৌহিত্র হাসান ইবন আলী (রা)-কে ডাকলেন। তিনি দৌড়ে এলেন এবং তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এরপর তাঁর দাড়ি মুবারকের ভিতর আঙ্গুল ঢোকাতে লাগলেন। এরপর তিনি তাঁর নিজের পবিত্র মুখ খুলে দিলেন এবং তিনি (হাসান) আপন মুখ তাঁর (রাসূলের) বরকতময় মুখের ভেতর প্রবেশ করালেন।"[৩]

---

১. শামাইলে তিরমিযী
২. আল-আদাবুল-মুফরাদ, বুখারী
৩. আল-আদাবুল-মুফরাদ, বুখারীকৃত পৃঃ ৭৩

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন : যায়দ ইবন হারিছা (রা) [যিনি রাসুল (সা)-এর গোলাম ছিলেন] যখন মদীনায় এলো, তখন তিনি ঘরেই ছিলেন। সে ঘরে এলো এবং দরজায় আঘাত করল। রাসূলুল্লাহ (সা) তখনই উঠে পড়লেন। সে সময় তাঁর শরীরের সর্বত্র কাপড়-ঢাকা ছিল না, শরীর থেকে চাদর গড়িয়ে পড়ছিল। এ অবস্থায় তিনি তাকে (যায়দ) দেখে জড়িয়ে ধরলেন, কোলাকুলি করলেন এবং চুমু খেলেন।"[১]

উসামা ইবন যায়দ (রা) বর্ণনা করেন : "রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জনৈক কন্যা রাসূল (সা)-কে পয়গাম পাঠান, আমার বাচ্চা মরণাপন্ন, মেহেরবানি করে আসুন। তিনি তাকে সালাম পাঠালেন এবং বললেন, সবই আল্লাহ্‌র– যা তিনি নিয়েছেন এবং যা তিনি দিয়েছেন। প্রতিটি বস্তু তাঁর দরবারে নামাঙ্কিত ও নির্ধারিত। অতএব ধৈর্যধারণ কর এবং পুরস্কারের প্রত্যাশী হও, আশায় বুক বাঁধো।

কন্যা কসম দিয়ে পাঠালেন, যেন তিনি অবশ্যই একবার আসেন। তিনি যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর সাথে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি সেখানে গিয়ে বসলে কোলে করে শিশুটি সেখানে আনা হলো। তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন। ঐ সময় তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। এ দেখে তাঁর চোখ ফেটে অবিরলধারায় পানি পড়তে লাগল। হযরত সা'দ (রা) আরয করলেন : 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কি (আপনিও কাঁদছেন)!' তিনি বললেন : এ স্নেহ-মমতার বহিঃপ্রকাশ– যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ভেতর যাকে চান দান করে থাকেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রহমদিল বান্দাদের ওপরই দয়া প্রদর্শন করে থাকেন।[২]

বদরের যুদ্ধবন্দীদের মাঝে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আপন চাচা আব্বাস (রা)-ও (তখনও তিনি মুসলমান হন নি) ছিলেন। অন্য যুদ্ধবন্দীদের মত তাঁকেও কষে বেঁধে রাখা হয়েছিল। ফলে, তিনি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন আর তাঁর কাতরানির কারণে তিনি ঘুমাতে পারছিলেন না। জনৈক সাহাবী বিষয়টি বুঝতে পেরে হযরত আব্বাস (রা)-এর বাঁধন একটু ঢিলা করে দিলেন। আনসার সাহাবীর এই মমতা দেখানো আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-কে উৎসাহিত করতে পারেনি। তিনি চাননি

---

১. তিরমিযী

২. বুখারী, কিতাবুল মারদ্বা, কিতাবুজ জানাইয باب قول النبى صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببكاء اهله

যে হযরত আব্বাস (রা) ও একজন সাধারণ যুদ্ধবন্দীর মধ্যে কোনরূপ ভিন্ন আচরণ করা হোক। ফলে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইচ্ছামতো অপরাপর বন্দীদের বাঁধনও অনুরূপ ঢিলা করে দেয়া হয়।

আনসার সাহাবী যখন দেখতে পেলেন, হযরত আব্বাস-এর বাঁধন ঢিলা করে দেয়াতে আল্লাহ্‌র রাসূল খুশি হয়েছেন, তখন তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাঁর চাচাকে মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দেয়া হোক! কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর এই পরামর্শ গ্রহণ করেননি।[১]

একবার জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলো এবং বলতে লাগল : "আপনারা কি আপনাদের ছেলেমেয়েদের স্নেহ করেন, মায়া করেন, ভালোবাসেন? আমরা তো তাদের মায়া করি না, ভালোবাসি না।" আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বললেন : "যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অন্তর থেকে দয়া-মায়া উঠিয়ে নিয়ে থাকেন, তাহলে আমি আর তোমাদের জন্য কী করতে পারি?"[২]

তিনি শিশুদের প্রতি খুবই সদয় ও স্নেহশীল ছিলেন এবং তাদের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ ও কোমল আচরণ করতেন। হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন : "একবার রাসূল (সা) খেলাধুলায় মত্ত কয়েকটি শিশুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন।"[৩]

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সঙ্গে একেবারে মিশে থাকতেন। আমার এক কনিষ্ঠ ভাইকে তিনি বলতেন, ওহে উমায়র! তোমার নুগায়র (একটা ছোট পাখি– যা নিয়ে শিশুরা বেশি সময় খেলা করে থাকে)-এর কি হলো?"[৪]

মুসলমানদের প্রতি তিনি অত্যন্ত সদয় ও স্নেহশীল ছিলেন। তিনি তাদের অবস্থার প্রতি খুব লক্ষ্য করতেন। মানব স্বভাবে বিরক্তি ও ক্লান্তিবোধ এবং সাময়িকভাবে তাদের মাঝে ভীরুতা ও কাপুরুষতা সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। এসবের দিকে তিনি বরাবর লক্ষ্য রাখতেন।

---

১. ফাতহুল বারী, ৮ম. খণ্ড. পৃঃ ৩২৪ মিসরী সংস্করণ
২. বুখারী, আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস, কিতাবুল আদব
৩. বুখারী
৪. আল-আদাবুল মুফরাদ

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে যে ওয়ায-নসীহত করতেন তা বিরতি দিয়ে করতেন এবং তা এজন্য করতেন যাতে তা আমাদের মাঝে বিরক্তি বা একঘেঁয়েমী সৃষ্টি না করে। সালাত বা নামাযের সঙ্গে এতটা প্রেম ও আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও যদি কোন শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেতেন অমনি সালাত সংক্ষিপ্ত করে দিতেন। তিনি নিজে বলেছেন : "আমি সালাতে দাঁড়াই এবং চাই দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে তা আদায় করি। অতঃপর কোন শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পাই। তখন এই ধারণায় সালাত সংক্ষিপ্ত করি যাতে তার মায়ের কোনরূপ উৎকণ্ঠা কিংবা মানসিক পীড়ার কারণ না হয়।"[১]

হযরত অবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) আরও বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আরয করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমি আমার মহল্লায় ফজরের নামাযে কেবল এজন্যই হাযির হই না যে, অমুক লোক সালাত খুবই দীর্ঘ আদায় করে থাকে। এরপর তিনি যে ওয়ায করলেন এর থেকে রাগান্বিত অবস্থায় আর কোন ওয়ায করতে আমি তাঁকে দেখিনি। তিনি বললেন : "তোমাদের মধ্যে সেইসব লোক রয়েছে যারা (ইবাদত ও সালাতের প্রতি) মানুষকে বিতৃষ্ণ ও বিরক্ত করে তুলছে। তোমাদের মধ্যে যারা সালাতে ইমামতি করবে, তাদের উচিত হবে তা সংক্ষিপ্ত করা। কেননা জামা'আতে উপস্থিত মুসল্লীদের মধ্যে দুর্বল লোক যেমন রয়েছে, তেমনি বৃদ্ধ ও প্রয়োজনের তাগিদে ব্যস্ত লোকও রয়েছে।"[২]

এই প্রসঙ্গে বলতে চাই, মহিলা যাত্রীদলে ছিল আনজাশা নামে জনৈক সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী– যার সুরেলা আবৃত্তিতে উট দ্রুত ছুটত। মহিলাদের এতে কষ্ট হতো। এই দেখে তিনি একদিন আনজাশাকে বললেন : "ওহে আনজাশা! একটু আস্তে। কাঁচের পাত্রগুলো ভেঙে যেতে পারে (অর্থাৎ দ্রুতগতির কারণে দুর্বল ও কোমল স্ত্রীলাকদের যেন কষ্ট না হয়)।"[৩]

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বক্ষ মুবারককে সব রকমের হিংসা-বিদ্বেষ ও অপরের ক্ষতি ও অমঙ্গল কামনা থেকে সযত্নে মুক্ত রেখেছিলেন। তাই তিনি বলতেন, "তোমাদের কেউ যেন আমার সামনে অপর কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ না

---

১. বুখারী, কিতাবুস-সালাত
২. প্রাগুক্ত
৩. আল-আদাবুল মুফরাদ, এ ছাড়াও বুখারী ও মুসলিম

করে। কেননা আমি চাই, তোমাদের সামনে যেন আমি এমন ভাবে হাযির হতে পারি যাতে, তোমাদের প্রতি আমার দিল সাফ থাকে।"[১]

মুসলমানের পক্ষে তিনি ছিলেন স্নেহশীল পিতার মতই, আর সমস্ত মুসলমান ছিল যেন তাঁর পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের সকলের যিম্মাদারী যেন তাঁরই কাঁধে ন্যস্ত। তিনি তাদের উপর এতটা সদয় ও স্নেহশীল ছিলেন এবং তাদের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ ছিলেন যতটা হয়ে থাকেন একজন মা তার সন্তানের প্রতি। মুসলমানদের নিকট তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের জীবিকার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা যে প্রাচুর্য দান করেছিলেন তার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তাদের ঋণ ও তাদের পিঠের ওপর চাপানো বোঝা হালকা করে তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, "কেউ সম্পত্তি রেখে-মারা গেলে, তা তার উত্তরাধিকারী তথা ওয়ারিসদের, আর কেউ ঋণ রেখে মারা গেলে তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার।"[২]

অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি বলতেন, "এমন কোন মুমিন নেই যার দুনিয়া ও আখিরাতে আমার চেয়ে বড় কোন অভিভাবক আছে। যদি চাও এই আয়াত পড়তে পার :

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ -

নবী মুমিনদের জন্য তাদের জীবনের চেয়েও বেশি বন্ধু ও সুহৃদ হয়ে থাকেন। [সূরা আহযাব : ৬]

এজন্যে কোন মুসলমান ইন্তিকাল করলে এবং তার পরিত্যক্ত কোন সম্পদ থাকলে, তা তার ওয়ারিস ও নিকটত্মীয়দের অধিকার হিসেবে গণ্য হবে, তা সে যেই হোক! কিন্তু যদি তার যিম্মায় কোন ঋণ থাকে, তবে সে যেন আমার কাছে আসে। তার অভিভাবক ও যিম্মাদার আমি।"[৩]

স্বভাব-প্রকৃতিতে ভারসাম্য

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যেই উন্নত স্তরের আখলাক এবং যেই সর্বোচ্চ শ্রেণীর স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত ভারসাম্য দান করেছিলেন, তা ছিল ভবিষ্যত শতাব্দীগুলোর এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পূর্ণতম বিকাশ। একে আমরা স্বভাবের ভারসাম্য, সুস্থ প্রকৃতি, অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও তীক্ষ্ণতা,

---

১. কিতাবুশ-শিফা, পৃঃ ৫৫, আবূ দাউদ সূত্রে বর্ণিত
২. বুখারী, কিতাবুল-ইসতিযকার
৩. বুখারী, কিতাবুল-ইসতিযকার

ভারসাম্যপূর্ণ ও কম-বেশির বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত বলে আখ্যায়িত করতে পারি। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, "আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) দু'টো কাজের মধ্যে যখন কোন একটিকে প্রাধান্য প্রদান করতেন,তখন সব সময় সহজতরটিকেই প্রাধান্য দিতেন; তবে এই শর্তে যে, এতে গুনাহের নাম-গন্ধও যেন না থাকে! যদি এতে গুনাহের সামান্যতম গন্ধও পাওয়া যেত, তবে তিনি এর থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে অবস্থান করতেন।"[১]

তিনি বেশি লৌকিকতা, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি যুহদ ও নির্লিপ্ততা এবং নফসের বৈধ অধিকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া থেকে অনেক দূরে ছিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন : "দ্বীন খুব সহজ; তবে কেউ যদি দ্বীনের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় এগিয়ে আসে, দ্বীন তার উপর বিজয়ী হবে, প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করবে। এজন্য মধ্যম পন্থায় ভারসাম্যপূর্ণ পথে চল। কাছের দিকগুলোর রেয়ায়াত কর, সন্তুষ্ট থাক এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও অন্ধকার রাতের ইবাদত থেকে শক্তি অর্জন কর।"[২]

তিনি এও বলতেন : "থাম, ততটুকুই কর, যতটুকু করার শক্তি তোমার রয়েছে। আর তা এজন্য যে, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ তা'আলা তো ক্লান্ত হয়ে পড়বেন না; বরং তোমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়বে।"

ইবন আব্বাস (রা) বলেন– রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কোন ধরনের দ্বীন বা ধর্ম সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয়? তিনি বললেন : "اَلْحَنِيْفِيَّةُ السَّمْحَةُ " সহজ ও নিষ্ঠাপূর্ণ দ্বীনে ইব্‌রাহীমী।"[৩]

আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন : "বাড়াবাড়ি ও জোর-যবরদস্তির সঙ্গে কাজ আদায়কারী ও খুঁত তালাশকারী ধ্বংস হয়েছে।"[৪]

তিনি যখন কোন সাহাবীকে কোথাও তালিম প্রদান ও ওয়ায-নসীহতের জন্য পাঠাতেন, তখন তাদেরকে বলতেন : "সহজ পন্থা অনুসরণ করবে, সংকীর্ণ করে তুলবে না। সুসংবাদ শোনাবে, হিংসুক ও ঘৃণ্য করে তুলবে না।" আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনিল আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : "আল্লাহ্

---

১. মুসলিম
২. বুখারী, কিতাবুল ঈমান, দ্বীন সহজ শীর্ষক অধ্যায়
৩. আল-আদাবুল মুফরাদ
৪. মুসলিম, অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে যে জোরযবরদস্তি ও বাড়াবাড়ি করে

তা'আলা তাঁর দেয়া নিয়ামতের বাহ্যিক প্রকাশ তাঁর বান্দার ওপর দেখতে পছন্দ করেন।"[১]

ঘরে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে

তিনি তাঁর ঘরে সাধারণ মানুষের মতই থাকতেন। যেমন হযরত আয়েশা (রা) নিজেই বর্ণনা করেছেন : তিনি তাঁর কাপড়-চোপড়ও পরিষ্কার করতেন, তিনি বকরির দুধও নিজ হাতে দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করতেন। তিনি নিজের কাপড়ে তালি লাগাতেন, জুতা সেলাই করতেন এবং এভাবেই আরও কাজ করতেন।

হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "তিনি তাঁর ঘরে কিভাবে থাকতেন। জবাবে তিনি বললেন, তিনি ঘরে কাজকর্মের ভেতর থাকতেন। যখন সালাতের ওয়াক্ত হত, তখন সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে চলে যেতেন।"[২]

এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি তাঁর নিজের জুতা মেরামত করে নিতেন, কাপড় সেলাই করতেন যেমন কেউ কেউ নিজেদের বাড়ি-ঘরে করে থাকে।[৩]

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কোমল ও সবচেয়ে বেশি মহানুভব ছিলেন। আর হাসির সময় মুচকি হাসি হাসতেন।[৪]

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, "আমি এমন কাউকে দেখিনি, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেয়ে আপন পরিবার-পরিজনের প্রতি অধিক সদয় ও স্নেহশীল।"[৫]

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যে তার পরিবার-পরিজনের নিকট সর্বোত্তম এবং আমি আমার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।"[৬]

---

১. তিরমিযী এই হাদীস আবওয়াবুল আদব-এ বর্ণনা করেছেন : باب ان الله يحب ان يرى أثر نعمته على عبده অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে যেসব নিয়ামতে ভূষিত করেছেন, বান্দার জীবনে তার প্রকাশ ঘটুক তা তিনি পছন্দ করেন। প্রাচুর্যের অধিকারী লোকে দরিদ্রবেশে থাকুক এ আল্লাহ্র নিয়ামতের নাশোকরী এবং প্রয়োজন ছাড়া আপন দারিদ্র্য প্রকাশ করাও তেমনি তাঁর অপছন্দ।

২. বুখারী, কিতাবুস-সালাত, আহমদ ও আবদুর রাযযাক সূত্রে

৩. মুসান্নিফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ২০৪৯২, ১১শ খণ্ড, পৃঃ ২৬০

৪. ইবনে আসাকির

৫. মুসনাদে আহমদ, আনাস (রা) বর্ণিত; মুসলিম

৬. ইবনে মাজাহ, باب حسن معاشر النساء

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো কোন খাদ্যবস্তুর দোষ খোঁজেন নি। যদি পছন্দ হয়েছে খেয়েছেন, পছন্দ না হলে তা খাননি।[১]

আপন আহলে বায়ত, পরিবার-পরিজন ও নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে তাঁর চিরদিনের অভ্যাস ছিল, যে যেই পরিমাণ তাঁর নিকটবর্তী হতো, বিপদাপদ ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাকে সেই পরিমাণ সামনে রাখতেন এবং পুরস্কার-পারিতোষিক ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের সময় তাকে সেই পরিমাণ পেছনে রাখতেন। যখন উৎবা, রবীআ, শায়বা ইবন রবীআ ও ওলীদ ইবন উৎবা (যারা ছিল আরবের নামী-দামী বীরপুরুষ ও রণনিপুণ সৈনিক) বদর প্রান্তরে কুরায়শদের পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে তাদের মুকাবিলায় চ্যালেঞ্জ করল এবং তাদের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বি আহ্বান করল, তখন তিনি আপন চাচা হামযা, চাচাত ভাই আলী ও নিকটাত্মীয় আবূ উবায়দা (রা) ডেকে পাঠালেন এবং তাদের মুকাবিলায় প্রেরণ করলেন। অথচ তিনি মক্কায় এসব বাহাদুর সৈনিকের মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে ভালোই জানতেন। মুহাজিরদের মধ্যে এমন অনেক বীরপুরুষ ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন– যারা তাদের সঙ্গে সেয়ানে সেয়ানে অবতীর্ণ হতে পারতেন। বনূ হাশিমের এই তিনজন ছিলেন তাঁরাই– যাঁরা রক্তসম্পর্কের দিক দিয়ে রাসূল (সা)-এর সবচেয়ে নিকটজন ছিলেন, ছিলেন একান্ত প্রিয়জন। কিন্তু তাদেরকে এই বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি অন্যদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দেননি, বরং তাঁদেরকেই মুকাবিলার জন্য পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত দেখুন, এই তিনজনকেই তিনি তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী করেন। মুকাবিলায় হযরত হামযা ও আলী (রা) সাফল্যের সঙ্গে বিজয়ী বেশে ও নিরাপদে ফিরে এলেন। আর আবূ উবায়দা (রা)-কে আহত অবস্থায় ময়দান থেকে উঠিয়ে আনা হলো।

তিনি যখন (বিদায় হজ্জের খুতবায়) সুদকে হারাম ও জাহিলী যুগের রক্তের বদলাকে বিলুপ্ত ঘোষণা করলেন, তখনও তার সূচনা করলেন তাঁরই শ্রদ্ধেয় চাচা আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব-এর পক্ষ থেকে। বিদায় হজ্জে দেয়া এই খুতবায় তিনি বলেন :

"জাহিলী যুগের সুদ প্রথা আজ থেকে রহিত ও বিলুপ্ত করা হলো এবং প্রথম যে সুদ আমি বিলুপ্ত করছি, তা আমারই আপনজন আব্বাস ইবন আবদুল

---

১. বুখারী, কিতাবুল আতইমা ও মুসলিম

মুত্তালিবের সুদ। জাহিলী যুগের রক্তের প্রতিশোধও আজ বিলুপ্ত করা হলো আর সে ক্ষেত্রে প্রথম যে রক্তের প্রতিশোধ বিলুপ্ত করা হলো, তা আমাদের রাবীআ ইবনুল হারিছ-এর সন্তানদের রক্ত।

পক্ষান্তরে, আরাম-আয়েশ ও পুরস্কার কিংবা প্রতিদানের প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি সাধারণ রাজা-বাদশাহদের কিংবা রাজনৈতিক নেতাদের আচরণ ও অভ্যাসের বিপরীতে এই সমস্ত বুযুর্গকে সবসময় পেছনে রেখেছেন এবং এঁদের মুকাবিলায় অন্যদের প্রাধান্য দিয়েছেন। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বর্ণনা করেন– গম ভাঙাতে ও যাঁতা ঘুরাতে ফাতেমা (রা)-এর খুবই কষ্ট হত। এ সময় তিনি জানতে পারলেন. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে বেশ কিছু দাসী এসেছে। তিনি পিতার খিদমতে হাযির হলেন এবং তাঁর (ফাতিমার) খিদমতের জন্য, কাজেকর্মে তাকে কিছুটা সাহায্যের জন্য একজন দাসী প্রদানের আবেদন জানালেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সে সময় ঘরে ছিলেন না। তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর খিদমতে এর উল্লেখ করলেন। হযরত আয়েশা (রা) একথা আল্লাহ্র রাসূলের কানে তুললেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের ঘরে তাশরীফ আনলেন। সে সময় আমরা ঘুমাবার জন্য বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। তাঁকে দেখেই আমরা দাঁড়াতে গেলাম। তিনি আমাদেরকে উঠতে নিষেধ করলেন। তাঁর হাত মুবারকের শীতলতা আমার বক্ষে অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি এ প্রসঙ্গের অবতারণা করে বললেন, "আমি কি তোমদেরাকে এর থেকে উত্তম কথা বলব না– যার আবেদন তুমি করেছিলে? যখন তুমি ঘুমাতে যাও, তখন ৩৩বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪বার আল্লাহু আকবার পড়বে। আমার কাছে তোমরা যা চেয়েছিলে, তার চেয়ে এটি উত্তম।"[১]

অপর এক বর্ণনায় এই ঘটনার সাথে এও বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁদেরকে বললেন, "আল্লাহ্র কসম ! আহলে সুফ্ফার সদস্যদের ক্ষুধায় পেট যখন পিঠের সাথে লেগে গেছে, তখন (তাদের জন্য একটা ব্যবস্থা না করে) তোমাদের জন্য আমি কিছুই দিতে পারি না। তাদের খরচ চালাবার মতো এ মুহূর্তে আমার কাছে কিছুই নেই। এদের (দাস-দাসীগুলো)-কে বিক্রি করে যা পাওয়া যাবে তা ওদের জন্য ব্যয় করব।[২]

---

১. বুখারী, কিতাবুল-জিহাদ

২. আহমাদ, ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৩, ২৪

সূক্ষ্মতর অনুভূতি, আবেগের মর্যাদা ও পবিত্রতা

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সীরাত তথা জীবনচরিত নবুয়ত ও দাওয়াত-ই হকের মহান দায়িত্ব, মানবতার জন্য দরদ ও মর্মজ্বালা এবং সেই চিন্তা-ভাবনা ও কর্তব্যের তাগিদের সাথে সাথে, পর্বতের পক্ষেও যার ভার বহন করা সহজসাধ্য ছিল না, সূক্ষ্ম মানবীয় অনুভূতি পবিত্র ও সমুন্নত আবেগপূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করছিল, সেই অস্বাভাবিক ইচ্ছাশক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে– যা আম্বিয়া (আ)-এর চিহ্ন ও বিশেষ চরিত্র হয়ে থাকে এবং যারা দাওয়াত ইলাল্লাহ ও আল্লাহ্‌র কালামের অতি মর্যাদার পথে এবং তাঁর হুকুম-আহকাম পালন করবার ক্ষেত্রে কোনকিছুকেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না এবং কোন বিষয়কে গুরুত্ব দেন না। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সাথীদেরকে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত ভোলেননি– যাঁরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন এবং সত্যের পথে নিজেদের সবকিছু সোপর্দ করে দিয়েছিলেন, যাঁরা ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করে চিরন্তন ও চিরস্থায়ী জীবন লাভ করেছিলেন, তাঁদের কথা তিনি বারবার আলোচনা করেছেন, তাঁদের জন্য দু'আ করেছেন এবং তাঁদের শেষ বিশ্রামস্থলে যিয়ারতে গেছেন।

এই ভালবাসা ও আস্থা মানবীয় দেহ অতিক্রম করে সেইসব নিষ্প্রাণ পাথর, পাহাড়-পর্বত ও উপত্যকা পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়েছিল– যেখানে প্রেম ও বিশ্বস্ততা, কুরবানী ও আত্মোৎসর্গের এই অপূর্ব দৃশ্য বিশাল বিস্তৃত আসমান দেখছিল এবং যেই উপত্যকা ভূমি তাঁদের অবস্থানস্থলে পরিণত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) একবার ওহুদ পাহাড়কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ "এই সেই পাহাড় যে আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরাও যাকে ভালবাসি।"[১]

আবি হুমায়দ (রা) বর্ণনা করেন : "আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে তাবূক যুদ্ধ থেকে ফিরছিলাম। আমরা যখন মদীনার কাছাকাছি এলাম, তখন তিনি বললেন, هٰذِهٖ طَابَةٌ وَهٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ "এই মদীনা তাবা আর এই সেই পাহাড় যে আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরা তাকে ভালবাসি।

উকবা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন ওহুদের শহীদগণের কবর যিয়ারত করতে গেলেন এবং তাদের জন্য দু'আ ও মাগফিরাত কামনা করলেন।[২]

---

১. বুখারী
২. প্রাগুক্ত

জাবির ইবন অবদুল্লাহ (রা) বলেন : আমি দেখলাম, আল্লাহ্‌র রাসূলের সামনে ওহুদের শহীদদের সম্পর্কে কথা উঠল। তখন তিনি বললেন : "আল্লাহ্‌র কসম! আমার ইচ্ছা ছিল আমিও যদি ওহুদের শহীদদের সাথে পাহাড়ের কোলে যেতে পারতাম!"

তিনি তাঁর প্রিয়তম চাচা ও দুধভাইয়ের শাহাদাতের বেদনায় ও শোকে (যিনি রাসূলের ভালবাসার টানে ও ইসলামের সাহায্য-সমর্থনে আপন জীবন বিলিয়ে দেন এবং তাঁর লাশ মুবারকের সঙ্গে যেই আচরণ করা হয়েছিল যা আর কারো সাথে করা হয়নি) উলুল-আজম (সুদৃঢ় ধৈর্যের অধিকারী) পয়গাম্বরদের ন্যায় ধৈর্যের সাথে বরদাশত করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন ওহুদ থেকে মদীনায় ফিরলেন এবং বনী আবদিল আশহাল-এর ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় শহীদদের জন্য কান্নার আওয়াজ তাঁর কানে ভেসে এল। আর এটাই তাঁর সূক্ষ্ম মানবীয় অনুভূতিতে অনুরণ সৃষ্টি করল, তাঁর চোখকে করে তুলল অশ্রুসিক্ত। তিনি বললেন, لٰكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ "কিন্তু হামযার জন্য কোন ক্রন্দনকারী নেই।"[১]

তথাপি এই অভিজাত ও উন্নত মানবীয় আবেগ-অনুভূতি, নবুওয়াত ও ইসলামের দাওয়াতের মহান যিম্মাদারী, আল্লাহ্‌র সীমারেখা হিফাযতের ব্যাপারে কোনরূপ প্রভাব-প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে পারেনি। সীরাত তথা জীবনচরিতকার ও ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন, সা'দ ইবন মু'আয ও উসায়দ ইবন হুদায়র (রা) যখন বনী আব্দুল আশহাল-এর ঘরে ফিরে এলেন, তখন তারা নিজেদের ঘরের মহিলাদের তৈরি হওয়ার জন্য হুকুম দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘরে গিয়ে তাঁর চাচা সায়্যিদুনা হামযা (রা)-এর শাহাদাতে শোক প্রকাশের জন্য বললেন। মহিলারা তাই করল। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘরে ফিরে মহিলাদেরকে মসজিদে নববীর দরজায় কান্নারত দেখতে পেলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, "আল্লাহ্ তোমাদের উপর রহম করুন। তোমরা যে যার ঘরে ফিরে যাও। তোমাদের এখানে আসাটাই শোক প্রকাশের সমান হয়ে গেছে।"

এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এসব কী হচ্ছে?" তাঁকে বলা হলো, আনসাররা তাদের মহিলাদেরকে কোন উদ্দেশ্যে এখানে পাঠিয়েছেন। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাইলেন এবং ভালভাবে ভদ্র ভাষায় সম্বোধন করে তাদেরকে বললেন, "আমার উদ্দেশ্য তা ছিল না যা তোমরা করছ, মৃতের জন্য

---

১. ইবন কাছীর, ৩য় খণ্ড, ৯৫; ইমাম আহমাদ এই হাদীস ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

কান্নাকাটি করা আমি পছন্দ করি না।" এরপর তিনি তাদেরকে মাতম করতে নিষেধ করলেন।[১]

এর থেকেও নাজুক মুহূর্ত দেখা দিয়েছিল আল্লাহ্‌র সিংহ সায়্যিদুনা হযরত হামযা (রা)-এর ঘাতক ওয়াহশীর ক্ষেত্রে। মুসলমানরা মক্কা জয় করলেন। ওয়াহশীর কাছে তখন গোটা পৃথিবী ঘন অন্ধকারে ছেয়ে যায় এবং সকল পথই সে অবরুদ্ধ দেখতে পায়। তার জন্য কুদরতীভাবেই সমস্যা সৃষ্টি হয়। সে সিরিয়া, ইয়েমেন কিংবা অন্য কোথাও গিয়ে লুকাবার ইচ্ছা করে কিন্তু লোকে তাকে বলল, "আরে ভালো মানুষ! আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) এমন কাউকেই হত্যা করেন না, যে তাঁর ধর্মে দাখিল হয় অর্থাৎ তিনি কোন মুসলমানকেই হত্যা করেন না।" বিষয়টা এবার সে বুঝতে পারলো এবং সাথে সাথে কালেমা শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল। মুসলমান হওয়ার পর সে যখন প্রথমবারের মত রাসূল পাক (সা)-এর দরবারে হাযির হলো, তখন তিনি তার ইসলাম গ্রহণকে কবূল করলেন এবং এমন কোন কথা বললেন না, যা তার মনে ভীতির সঞ্চার হতে পারে। এরপর তিনি তার থেকে হযরত হামযা (রা)-এর শাহাদতের বিবরণ শুনলেন অর্থাৎ হামযা (রা)-কে কিভাবে হত্যা করা হয়েছিল। বিবরণ পেশ করতে তার ভিতর সূক্ষ্ম মানবীয় অনুভূতি ও অবস্থা অবশ্যই সৃষ্টি হয়ে থাকবে। কিন্তু এই বিশেষ অবস্থা তাঁর নববী মেজাজ ও দায়িত্ববোধের উপর প্রাধান্য পায়নি– তিনি তার ইসলাম গ্রহণ মেনে নেবেন না, কিংবা ক্রোধের বশে তাকে হত্যাই করবেন (না, এমনটি হয়নি, হতে পারে না)। কেবল তাকে এটুকু বললেন, "আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি আমার সামনে এসো না। আমি চাই তুমি যেন আমার সামনে না পড়!" ওয়াহশী বললেন, এরপর থেকে আমি তাঁর সামনে যেতে চাইতাম না যাতে আমার উপর তাঁর চোখ পড়ে যায়। আর এভাবেই তাঁর নির্ধারিত ও প্রতিশ্রুত সময় এসে যায়।[২]

বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে : আমার উপর যখন তাঁর চোখ পড়ল, তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি ওয়াহশী? আমি বললাম। হ্যাঁ (আমি ওয়াহশী)।

তিনি বললেন, "তাহলে তুমিই হামযাকে শহীদ করেছিলে?" আমি বললাম, "আপনি যা জেনেছেন তা সত্য।" তিনি বললেন, "তুমি কি এতটুকু করতে পার, তুমি আর আমার সামনে আসবে না ?"[৩]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২
২. ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭২
৩. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী

এই প্রকৃতিগত ও মানবীয় অবস্থা ও অনুভূতি এবং উন্নত ও সূক্ষ্ম আবেগের ঝলক আমরা সেখানেও দেখতে পাই। যখন তিনি মাটিতে মিশে যাওয়া একটি পুরনো কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন তখন নিজেকে আর স্থির রাখতে না পেরে কেঁদে ফেললেন। এরপর তিনি বললেন : "এ (আমার মা) আমিনার কবর।" এ ছিল তখনকার কথা যখন তাঁর (মা আমিনার) ইন্তেকালের পর বহুদিন গত হয়েছে।

উদারতা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) সর্বোত্তম আখলাক ও চরিত্র, দয়া, বদান্যতা ও বিনয়ের ক্ষেত্রে সমগ্র মানবতার ইমাম ও অগ্রনায়ক ছিলেন।

আল্লাহ্ তা"আলা ইরশাদ করেন : إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

"হে রাসূল! আপনি নিশ্চিতই মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

অপরদিকে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) স্বয়ং বলেছেন : أَدَّبَنِىْ رَبِّىْ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِىْ "আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।"

হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى بَعَثَنِىْ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ كَمَالِ مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ-

"আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সর্বোত্তম আখলাক-চরিত্র ও উত্তম কার্যাবলীর পূর্ণতাদানের জন্য পাঠিয়েছেন।"

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আখলাক-চরিত্র কেমন ছিল? এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন : كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ "আখলাক চরিত্রে তিনি কুরআনুল-কারীমের বাস্তব প্রতিমূর্তি ছিলেন।"

[সহীহ মুসলিম, আয়েশা (রা) বর্ণিত]

ক্ষমাশীলতা, ধৈর্য-সহ্য, প্রশস্ত হৃদয় ও সহনশীলতার ক্ষেত্রে তাঁর যে অবস্থানগত মর্যাদা ছিল, সে পর্যন্ত মেধার অধিকারীর মেধা ও কবির কল্পনাও পৌঁছতে পারে না।

যদি এসব ঘটনা সেই নির্দিষ্ট পন্থায় বর্ণনা না করা হতো– যা সকল সন্দেহ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে, তাহলে লোকের মেধা ও মনন আজ তা গ্রহণ করত না। কিন্তু এসব বর্ণনা এতটা সঠিক, নির্ভুল ও অব্যাহত সনদে একজন নির্ভরযোগ্য, ন্যায়পরায়ণ রাবী থেকে আরেকজন নির্ভরযোগ্য ন্যায়পরায়ণ রাবী পর্যন্ত এরূপ

সংযত ও সতর্কতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এসবের ভিতর এমন ধারাবাহিক সূত্র পাওয়া যায় যে, এর দরুন এসব বর্ণনা নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলীল-দস্তাবেজের তুলনায় অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।

এ প্রসঙ্গে আমরা কতকগুলো ঘটনা বর্ণনা করব। তাঁর দয়া, দানশীলতা ও চরম থেকে চরমতম দুশমনকেও সৌজন্য প্রদর্শন ও সহানুভূতিমূলক আচরণের একটি নমুনা ছিল সেই ঘটনাটি, যখন মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলূলকে[১] কবরে নামানো হয়। তিনি সেখানে গমন করেন এবং তাকে কবর থেকে বের করবার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি তার লাশ হাঁটুর উপর নিলেন, পবিত্র মুখের থুথু তার উপর নিক্ষেপ করলেন এবং নিজের পরনের জামা দিয়ে তাকে কাফন পরালেন।[২]

আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে চলছিলাম। সে সময় তিনি নাজরানের কাপড় পরেছিলেন যার প্রান্তদেশ ছিল মোটা। পথিমধ্যে এক বেদুঈনের সঙ্গে দেখা। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাদর মুবারক ধরে জোরে টান দিল। আমি চোখ তুলে দেখতে পেলাম জোরে টান দেয়ার ফলে তাঁর গলায় দাগ পড়ে গেছে। এরপর সেই বেদুঈন বলল : ওহে মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌র যে মাল আপনার কাছে রয়েছে, তা আমাদের দেয়ার জন্য হুকুম দিন। তিনি তার দিকে ঘুরে দেখলেন এবং হাসলেন, তারপর তাকে তার প্রার্থিত বস্তু দেয়ার ব্যবস্থা করলেন।[৩]

যায়দ ইবন সু'না (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) রাসূল (সা)-এর কাছে এলো এবং তাকে ধার পরিশোধের দাবি জানালো– যা তিনি তার কাছ থেকে নিয়েছিলেন। এরপর সে কাপড় ধরে তাঁর কাঁধে জড়িয়ে সজোরে টানা-হেঁচড়া করল। কাপড়ের প্রান্ত মুঠিতে ধরে রাখলো এবং রূঢ় ভাষায় কথা বলল। সে এরপর আরও বলল : তোমরা আব্দুল মুত্তালিবের বংশের লোক। বড় টালবাহানা কর তোমরা।

হযরত উমর (রা) সেখানে ছিলেন। তিনি লোকটির নিষ্ঠুর ও রূঢ় আচরণ লক্ষ্য করে তাকে ধমক লাগালেন এবং কড়া ভাষায় কথা বললেন। কিন্তু এতসব

---

১. ৯ম হিজরীতে তাবূক যুদ্ধ থেকে ফেরার পর যিলকাদাহ মাসে তার মৃত্যু হয়। আয-যারকানী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১২-১১৩

২. বুখারী, কিতাবুয জানাইয, সঙ্ক্ষিপ্ত

৩. বুখারী, কিতাবুজ জিহাদ كان النبى صلعم يعطى المولفة قلوبهم শীর্ষক অধ্যায়। এ ছাড়াও ইমাম আহমদ, ৩য়, খণ্ড, ১৫৩, (শব্দের সামান্য পরিবর্তনসহ)

সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে হাসি লেগেই ছিল। তিনি হযরত উমর (রা)-কে বললেন, "উমর! আমি ও এই লোক তোমার কাছে অন্যরকম ব্যবহার পাবার হকদার ছিলাম। দরকার তো ছিল, তুমি আমাকে সত্ত্বর কর্জ পরিশোধের পরামর্শ দিতে আর তাকে বলতে নরম ও মোলায়েম ভাষায় তাগাদা দিতে।" এরপর তিনি জানালেন যে, তার ঋণ-পরিশোধের এখনও তিনদিন সময় বাকী আছে। যাই হোক, তিনি হযরত উমর (রা)-কে এ ঋণ পরিশোধের জন্য নির্দেশ দিলেন এবং আরও বিশ সা' বেশি দেবার জন্য বললেন এজন্য যে, হযরত উমর (রা) তাকে ভীত-শংকিত করে দিয়েছিলেন। আর এ কথাই তার অর্থাৎ পাওনাদার লোকটির (যায়দ ইবন সু'নার) ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিলো।[১]

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, "একবার মক্কা থেকে ৮০ জন সশস্ত্র লোক তানঈম পাহাড় বেয়ে হঠাৎ নেমে আসে এবং প্রতারণা করে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায়। তিনি সবাইকে বন্দী করেন, কিন্তু কাউকে প্রাণে না মেরে সবাইকে জীবিত রাখেন।"[২]

জাবির (রা) বর্ণনা করেন : আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে একবার নজদের দিকে অভিযান পরিচালনা করি। পথিমধ্যে দুপুর হয়ে গেল এবং আমরা বিশ্রাম নেবার প্রয়োজনবোধ করছিলাম। তলোয়ার ছিল গাছের ডালে ঝোলানো। লোকেরা এদিক-সেদিক বিভিন্ন গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিল। এ অবস্থায় আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আমাকে ডাক দিলেন। আমরা রাসুল (সা)-এর খিদমতে এসে দেখি এক বেদুঈন তাঁর সামনে বসা। তিনি বললেন : "আমি শুয়ে ছিলাম। এই লোক এসে আমার তলোয়ার টেনে নামায়। আমি জেগে দেখতে পেলাম সে তলোয়ার হাতে আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে। সে আমাকে বলল, এখন আমার হাত থেকে কে তোমাকে বাঁচাবে? আমি বললাম : আল্লাহ্! এরপর সে তলোয়ার খাপে বন্ধ করল এবং বসে পড়ল।[৩] এই সে লোক যে এখন তোমাদের সামনে বসা।" বর্ণনাকারী (হযরত জাবির) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) তাকে কোন শাস্তি দেননি।[৪]

---

১. বায়হাকী (বিস্তারিতভাবে): আহমদ, ৩য় খণ্ড, ১৫৩, (কিছুটা শাব্দিক পার্থক্যসহ)

২. মুসলিম, কিতাবুজ জিহাদ ওয়াস সিয়ার, আল্লাহ্‌র বাণী : وهو الذى كف أيديهم عنكم

৩. এখানে شام শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে– যার দু'টো অর্থ হতে পারে : এক, সে তলোয়ার খাপে বন্ধ করল। দুই, সে তলোয়ার টেনে নিল এবং তা দেখল (মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার)

৪. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, মুস্তালিক যুদ্ধ শীর্ষক অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অবস্থা ছিল এরূপ যে, সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের ধৈর্য একত্র করলেও তার সমকক্ষ হবে না। অথচ সাহাবায়ে কিরাম (রা) সকলেই ধৈর্যের প্রতিমূর্তি ছিলেন। ওপরের সকল ব্যাপারে সকলের জন্যই তাঁর ভূমিকা ছিল একজন স্নেহশীল উস্তাদ, একজন রহমদিল ও মেহেরবান সংস্কারক মুরুব্বীর। এর একটি নমুনা আমরা হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনায় দেখতে পাই। তিনি বলেন– একবার এক বেদুঈন মসজিদে প্রস্রাব করে দিল। লোকেরা তা দেখতে পেয়ে তেড়েফুঁড়ে এলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন : "তাকে তোমরা ছেড়ে দাও এবং যেখানে সে প্রস্রাব করেছে সেখানে এক বালতি পানি ঢেলে দাও। মনে রেখ, তোমাদেরকে আসানী সৃষ্টিকারী হিসাবে পাঠানো হয়েছে, দুর্বিষহ বিড়ম্বনা সৃষ্টিকারী হিসাবে নয়।"[১]

মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। এক ব্যক্তি হাঁচি দিল। আমি জওয়াবে ইয়াহামুকাল্লাহ' বললাম। লোকে আমাকে জওয়াব দিতে শুনে রাগে আমার দিকে তাকাতে লাগল। আমি বললাম, তোমাদের মা তোমাদেরকে কাঁদাক! কী হয়েছে যে, তোমরা আমার দিকে এভাবে রেগে তাকাচ্ছ? শুনে লোকেরা তাদের নিজেদের রানের ওপর থাপ্পড় মারতে লাগল।

যখন আমি বুঝতে পারলাম তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে, তখন আমি চুপ করলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত আদায় থেকে মুক্ত হলেন। আমার পিতামাতা তাঁর জন্য কুরবান হোক! আমি এর আগে তাঁর মত মুরুব্বী ও শিক্ষক দেখিনি এবং এরপরও দেখিনি। আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, তিনি আমাকে শাসাননি, আমাকে ভালমন্দও কিছু বলেননি। কেবল এতটুকু বলেছেন, "সালাত আদায়রত অবস্থায় সাধারণত মানুষ যেভাবে কথা বলে, সেভাবে কথা বলা উচিত নয়। সালাত কেবল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য।"[২]

আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) খুবই রহমদিল ছিলেন। তাঁর নিকট কোন অভাবী লোক কিংবা কোন লোক প্রয়োজন নিয়ে এলে তিনি অবশ্যই তাকে কিছু দেবার কথা দিতেন। কিছু থাকলে (দেবার মত)

---

১. বুখারী, কিতাবুল-উযূ
২. মুসলিম, 'সালাতে কথা বলা হারাম' শীর্ষক অধ্যায়

তখনই দিয়ে তার প্রয়োজন মেটাতেন। একবার সালাত দাঁড়িয়ে গেছে। এমন সময় জনৈক বেদুঈন সামনে এগিয়ে এলো এবং তাঁর কাপড় ধরে বলতে লাগল, "আমার একটা মামুলী প্রয়োজন বাকি আছে। আমার ভয় হয়, না জানি আমি ভুলে যাই!" তিনি তার সাথে গেলেন। সে তার কাজ শেষ করলে তিনি ফিরে এলেন এবং সালাত আদায় করলেন।[১]

তাঁর ধৈর্য, সহনশীলতা ও সহ্যশক্তি, উদার হৃদয় ও অটুট ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে সাক্ষ্য তাঁরই খাদিম হযরত আনাস (রা) প্রদত্ত সাক্ষ্য থেকে পাওয়া যাবে। সে সময় তিনি খুবই অল্পবয়স্ক ছিলেন। তিনি বলেন– আমি দশ বছর ধরে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর খিদমত করেছি। তিনি কখনও উহ্ বলেননি এবং কখনও এও বলেননি যে, "অমুক কাজ তুমি কেন করলে আর অমুক কাজ তুমি কেন করলে না?"[২]

সু'আদ ইবন উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলাম। আমার কাপড়ে জাফরানমিশ্রিত খোশবুর চিহ্ন দিল। তিনি দেখে বললেন, ورس ، روس "ফেলে দাও, ফেলে দাও"।[৩] তারপর তিনি ছড়ি দিয়ে আমার পেটের উপর আঘাত করলেন। এতে আমি কষ্ট পাই। আমি বললাম, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এখন আমার উপর কিসাস (বদলা, বিনিময়) গ্রহণের অধিকার এসে বর্তেছে।" অমনি রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর পেটের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, "কিসাস নিয়ে নাও"।[৪]

তাঁর বিনয়

তাঁর বিনয় ছিল অত্যধিক মাত্রায়। কোনকিছুতেই ও কোন ক্ষেত্রেই তিনি বিশিষ্ট ও দীপ্তিমান হওয়া পছন্দ করতেন না এবং এও ভাল মনে করতেন না যে, লোকে তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে পড়ুক কিংবা তাঁর প্রশংসা ও স্তুতির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন করুক, যেমনটি অতীতের বহু উম্মত তাদের নবীদের বেলায় করেছে অথবা কেউ তাঁকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল হওয়া থেকেও তাঁর মর্যাদা ঊর্ধ্বে তুলে ধরুক তাও তিনি পছন্দ করতেন না। হযরত আনাস (রা) বলেন, "আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেয়ে বেশি প্রিয় আর কিছুই ছিল না।

---

১. মুসলিম কিতাবুল-ফাযাইল (حسن خلق صلى) শীর্ষক অধ্যায়
২. মুসলিম, কিতাবুল-ফাযাইল
৩. এক ধরনের হলদে রং, যা দিয়ে কাপড় রঞ্জিত করা হয়।
৪. কিতাবুশ-শিফা, প্রতিশোধের কামনায় নয়, ভালবাসার টানে বলেছিল।

আমরা তাঁকে দেখতাম এবং এই ধারণায় দাঁড়াতাম না যে, তিনি তা পছন্দ করেন না।"[১]

তাঁকে বলা হয়েছে, يا خير البرية অর্থাৎ, "যে সৃষ্টির সর্বোত্তম মানুষ!" তখন তিনি বলেন, ذاك ابراهيم عليه السلام "এ মর্যাদা তো ইব্‌রাহীম (আ)-এর জন্য নির্ধারিত।"[২]

হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন : "আমার প্রশংসা এভাবে বাড়িয়ে করো না যেভাবে খ্রিস্টানরা ঈসা ইবন মরিয়ম (আ)-এর করেছিল। আমি তো কেবল আল্লাহ্‌র একজন বান্দা! তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল বলবে।"[৩]

আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফা (রা) বর্ণনা করেন, "আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) কোন গোলাম কিংবা বিধবার সঙ্গে পথ চলতে এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে কোনরূপ লোক-লজ্জা অনুভব করতেন না।"[৪]

হযরত আনাস (রা) বলেন, "মদীনার দাসী-বাঁদীরা কেউ এসে তাঁর হাত ধরত এবং যা কিছু বলার বলত, যতদূর পারত হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত।[৫]

আদী ইবন হাতিম আত-তাঈ (রা) যখন তাঁর খিদমতে হাযির হলেন, তখন তিনি তাঁকে নিজের ঘরে ডেকে নিলেন। একজন দাসী হেলান দেবার জন্য একটি বালিশ এগিয়ে দিল। তিনি বালিশটা নিয়ে আদী ও তাঁর মাঝে রেখে দিলেন এবং নিজে মাটির উপর বসে পড়লেন। আদী (রা) বলেন, এ থেকেই আমি বুঝতে পারলাম তিনি কোন বাদশাহ নন।[৬]

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন : "আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) পীড়িতের সেবা করতেন, জানাযায় শরীক হতেন, গাধার ওপরও চড়তেন এবং ক্রীতদাসের দাওয়াতও কবূল করতেন।"[৭]

---

১. তিরমিযী ও মুসনাদ আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩২
২. মুসলিম, কিতাবুল-ফাযাইল
৩. বুখারী, কিতাবুল-আম্বিয়া
৪. বায়হাকী, রাসূলুল্লাহর বিনয় শীর্ষক অধ্যায়
৫. মুসনাদে আহমদ, ৩য় খণ্ড,পৃ. ১৯৮-২১৫ ও জামউল-ফাওয়াইদ, ২য় খণ্ড, কিতাবুল-মানাকিব
৬. যাদুল-মাআদ, ১ম খণ্ড, ৪৩
৭. শামাইলে তিরমিযী, রাসূল (সা)-এর বিনয়

জাবির (রা) বর্ণনা করেন : "আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) চলার সময় দুর্বল লোকদের কথা ভেবে চলার গতি শ্লথ করে দিতেন এবং তাদের জন্য দু'আ করতেন।"[১]

আনাস (রা) বর্ণনা করেন : "আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-কে যবের রুটি ও স্বাদ নষ্ট হতে যাচ্ছে এমন তরকারির দাওয়াত দেয়া হলেও তিনি তা কবূল করতেন।"[২]

তাঁর থেকেই আরেকটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) ইরশাদ করেন : "আমি একজন দাস, দাসের মতই খাই এবং দাসের মতই বসি।"[৩]

আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনিল 'আস (রা) বর্ণনা করেন, "আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আমার ঘরে তশরীফ নিলেন। আমি ছালভর্তি চামড়ার একটি বালিশ তাঁর খিদমতে পেশ করলাম। তিনি মাটির ওপরই বসে পড়লেন এবং বালিশটি আমার ও তাঁর মাঝে রেখে দিলেন।"[৪]

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) নিজের ঘর নিজেই পরিষ্কার করতেন, উট বাঁধতেন, পশুর ঘাসপাতাও দিতেন, খিদমতগারের সঙ্গে বসে একই আসনে খানা খেতেন, আটা মাখতে তাকে সাহায্য করতেন এবং বাজার থেকে প্রয়োজনীয় সওদা নিজেই নিয়ে আসতেন।[৫]

বীরত্ব, সাহসিকতা ও লজ্জা-শরম

তাঁর চরিত্রে বীরত্ব, সাহসিকতা ও লজ্জা-শরম (যাকে অধিকাংশ মানুষ পরস্পর বিপরীত মনে করে) একই রূপ ছিল। তাঁর লজ্জাশীলতা সম্বন্ধে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, "তিনি পর্দানশীন কুমারী বালিকার চেয়েও অধিক লাজুক ছিলেন। কোন জিনিস তাঁর অপছন্দনীয় হলে তাঁর চেহারায় এর প্রতিক্রিয়া দেখা যেতো।"[৬]

অতিরিক্ত লজ্জা-শরমের কারণে কারো মুখের উপর এমন কথা বলতে পারতেন না– যা তার নিকট বিষাদের কারণ হবে। এটির ভার তিনি অন্যকে

---

১. মুনযিরীকৃত আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব
২. শামাইলে তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদ, ৩য় খ., পৃঃ ২১১-২৮৯
৩. আশ-শিফা ১০১ পৃঃ
৪. আল-আদাবুল মুফরাদ পৃঃ ১৭২
৫. কিতাবুশ-শিফা, ১০১ পৃঃ বুখারীর বর্ণনামতে
৬. বুখারী, কিতাবুল-মানাকিব

সোপর্দ করতেন। হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন– একবার আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর মজলিসে জনৈক ব্যক্তির কাপড়ে হলদে রঙ বেশি দেখা যাচ্ছিল। যেহেতু তিনি কারো মুখের ওপর এমন কথা বলা পছন্দ করতেন না, যা তার নিকট খারাপ লাগবে। এজন্য সে যখন উঠে পড়ল, তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, "খুবই ভাল ছিল যদি তোমরা তাকে হলদে রঙের কাপড় ব্যবহার করা ছেড়ে দেবার জন্য বলে দিতে।"[১]

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : যখন তিনি কারো সম্বন্ধে খারাপ কিছু জানতে পেতেন তখন তিনি তার নাম ধরে এ কথা বলতেন না যে, সে এ কাজ কেন করল। বরং তিনি এভাবে বলতেন, "লোকের কি হলো যে, তারা এ রকম বলে কিংবা এ রকম করে।" তিনি তার বিরোধিতা করতেন বটে, কিন্তু অভিযুক্তের নাম প্রকাশ করতেন না।[২]

তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা সম্পর্কে শেরে আল্লাহ্ আলী মুর্তাযা (রা)-এর সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে বলে আশা করি। তিনি বলেন, "যুদ্ধ যখন তীব্র আকার ধারণ করত এবং মনে হতো চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে, ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে খুঁজে বেড়াতাম যাতে আমরা তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি এবং দেখতে পেতাম তিনি শত্রু থেকে খুব বেশি দূরে নন; অর্থাৎ সে সময় অন্যদের তুলনায় তিনিই শত্রুর কাছাকাছি থাকতেন। বদর যুদ্ধে আমাদের এই অবস্থায়ই ছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আশ্রয় নিচ্ছিলাম আর তিনি আমাদের সকলের তুলনায় শত্রুর সবচেয়ে বেশি কাছে ছিলেন।"[৩]

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন : "আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) সকলের চেয়ে বেশি সুন্দর ও দীপ্তিমান, সবচেয়ে বেশি দানশীল ও সবচেয়ে বেশি বীর বাহাদুর ছিলেন। এক রাতে মদীনার লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল সেদিকে ছুটে গেল। পথিমধ্যে সকলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাক্ষাত হলো। তিনি তখন ফিরে আসছিলেন। তিনি আওয়াজ পেতেই সকলের আগেই বেরিয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলছিলেন : "ভয় পাবার কারণ নেই, কোন ভয় নেই।" তিনি সে সময় আবূ তালহা (রা)-এর ঘোড়ার পিঠে ছিলেন যার পিঠে জীনও ছিল না। তাঁর কাঁধে তখন তলোয়ার ঝুলছিল। তিনি

---

১. শামাইলে তিরমিযী
২. আবূ দাউদ
৩. আশ-শিফা, পৃঃ ৮৯

ঘোড়ার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, "আমি একে সমুদ্রের মত গতিশীল, প্রবহমান ও দ্রুত গতিসম্পন্ন পেয়েছি।"[১]

ওহুদ ও হুনায়ন যুদ্ধে যখন বড় বড় বীর বাহাদুর শত্রুপক্ষের তীব্র আক্রমণে বিক্ষিপ্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়ছিল এবং রণক্ষেত্র ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল, সে সময়ও তিনি তাঁর খচ্চরের ওপর তেমনি প্রশান্ত চিত্তে ও দৃঢ়তার সঙ্গে আপন অবস্থানে অটল ছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন কিছুই হয়নি। তিনি তখন নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করে চলেছিলেন :

اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ * اَنَا اِبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ۔

"আমি নবী, মিথ্যা নই; আবদুল মুত্তালিবের বংশধর আমি (এও তেমনি মিথ্যা নয়)।"

স্নেহ-ভালবাসা ও সাধারণ দয়ামায়া

এই ধরনের বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে সাথেই তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। তাঁর চক্ষু সহজেই অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠত। দুর্বল মানুষ, এমনকি অবলা পশুর প্রতি সদয় ব্যবহারের জন্যও তিনি নির্দেশ দিতেন। শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) বলেন– আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে ভাল ব্যবহার ও কোমল আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য হত্যা করতে চাইলেও ভালভাবে কর, যবেহ করলেও ভালভাবে কর। তোমাদের কেউ পশু যবেহ করতে চাইলে সে যেন তার ছুরি ভালভাবে শান দিয়ে নেয় এবং যবেহর সময় যেন কষ্ট না দেয়।"[২]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– এক ব্যক্তি একটি বকরী যবেহর জন্য মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ছুরিতে শান দিতে লাগল। রাসূলুল্লাহ (সা) তা দেখে তাকে বললেন, "তুমি কি তাকে দু'বার মারতে চাও? তাকে শুইয়ে দেবার আগেই কেন তুমি ছুরিতে শান দিয়ে নিলে না?"[৩]

তিনি সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে জীব-জানোয়ারকে ঘাসপাতা খাবার দেবার জন্য নির্দেশ দিতেন এবং তাদেরকে পেরেশান করতে ও ওদের পিঠে ওদের সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপাতে নিষেধ করেন। পশুর কষ্ট দূর করা ও ওদের

---

১. আল-আদাবুল-মুফরাদ, পৃঃ ৪৬ বুখারী-মুসলিমের বর্ণনাসূত্রে
২. মুসলিম, الامر باحسان الذبح শীর্ষক অধ্যায়; কিতাবুয-যাবহ
৩. তাবারানী ও হাকিম-এর মতে হাদীসটি বুখারীর শর্ত মুতাবিক সহীহ

আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করাকে তিনি সাওয়াব বা পুরস্কারের কারণ এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের মাধ্যম বলে মনে করেন। তিনি এর ফযীলতও বর্ণনা করেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন– রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন : "এক ব্যক্তি কোথাও সফরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তার তীব্র পিপাসা লাগে। তিনি একটু দূরে একটি কুয়া পেলেন এবং এতে নেমে পড়লেন। পানি পানের পর তিনি ওপরে উঠে এসে দেখতে পেলেন, একটা কুকুর পিপাসায় পানির অভাবে কাদামাটি চাটছে। লোকটি মনে মনে ভাবলেন, পিপাসায় আমার যে অবস্থা হয়েছিল, এর অবস্থাও তো সেরূপই। তিনি পুনরায় কুয়ায় নামলেন। নিজের চামড়ার মোজায় পানি ভর্তি করলেন, অতঃপর পানিভর্তি মোজাটি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ওপরে উঠে এলেন এবং কুকুরটিকে পানি পান করালেন। আল্লাহ্ তা'আলা তার এই আমলকে কবূল করলেন এবং তার বিগত জীবনের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। লোকেরা আরয করল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! পশু-পাখি ও জীব-জানেয়ারের ব্যাপারেও পুরস্কার রয়েছে?" তিনি বললেন : "সৃষ্টি জগতের এমন প্রতিটি বস্তুতে পুরস্কার রয়েছে, যার প্রাণ রয়েছে, যা তরতাজা ও জীবন্ত।"[১]

আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "জনৈক মহিলাকে কেবল এজন্যই শাস্তি দান করা হয়েছিল যে, সে তার বিড়ালটাকে খেতে দেয়নি, বিড়ালটাকে বেঁধে রাখার কারণে সে কোন কিছু শিকার করেও খেতে পারেনি। ফলে সেটা মারা গিয়েছিল।"[২]

সুহায়ল ইবন আমর (অন্য বর্ণনায় সুহায়ল ইবনুর রবী ইবন আমর) (রা) বর্ণনা করেন– আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) একবার পথ চলতে একটি উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। উটটা অনাহারে থাকার দরুন শীর্ণকায় হয়ে গিয়েছিল এবং তার পেট পিঠের সাথে লেগে গিয়েছিল। এটা দেখে তিনি (উটের মালিককে ডেকে) বললেন, "এসব অবলা পশুর ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এর পিঠে যখন উঠবে, তখন ভালভাবে উঠবে। যখন যবেহ করে তার গোশত খাবে, তখনও যেন সে ভাল অবস্থায় থাকে।"[৩]

---

১. বুখারী, কিতাবুল-মুসকাত; মুসলিম, পশুকে পানি পান করানোর ফযীলত শীর্ষক অধ্যায়
২. ইমাম নববী, মুসলিম বর্ণিত
৩. আবূ দাউদ ما يؤمر به من القيام على السواء অধ্যায়

আবদুল্লাহ ইবন জাফর (রা) বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ (সা) জনৈক আনসারীর ঘেরাও পাঁচিলের ভেতর প্রবেশ করলেন। ভেতরে একটি উট ছিল। রাসূল (সা)-কে দেখেই উটটি ডাকতে লাগল এবং তার চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় পানি ঝরতে লাগল। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) তার কাছে গেলেন এবং তার কুঁজ ও পিঠের ওপর হাত বোলালেন। এতে উটটি শান্ত হলো। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উটটির মালিক কে? এমন সময় এক আনসারী যুবক এলো এবং উটটি তার বলে জানাল। তিনি তাকে বললেন, "যে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এ পশুর মালিক বানিয়েছেন, তাঁকে কি তুমি ভয় পাও না? সে তোমার বিরুদ্ধে আমার কাছে অভিযোগ করছে, তুমি তাকে কষ্ট দাও এবং সব সময় তাকে কাজে লাগিয়ে রাখ?"[১]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন– আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেন : "যদি তোমরা সবুজ শ্যামল কোন জায়গায় যাও, তখন সেখানে জোরে হাঁটবে, যদি রাতে কোথাও ছাউনি ফেলতে হয়, তবে রাস্তার উপর ফেলবে না এজন্য যে, সেখানে জীব-জানোয়ার চলাফেরা করে থাকে এবং পোকা-মাকড় আশ্রয় নেয়।"[২]

ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেন– আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর সঙ্গে একবার সফরে ছিলাম। তিনি একটি জরুরী প্রয়োজনে সেখান থেকে কিছুক্ষণের জন্য অন্যত্র যান। ইতোমধ্যে আমরা একটি ছোট্ট পাখি দেখতে পেলাম, যার সাথে দু'টো ছানা ছিল। আমরা ছানা দু'টো নিয়ে এলাম। পাখিটা তা দেখে পাখা ঝাপটাতে লাগল। এমন সময় আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) ফিরে এলেন এবং এ দৃশ্য দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ছানা দু'টো ছিনিয়ে এনে পাখিটাকে কে কষ্ট দিয়েছে?" এরপর তিনি ছানা দু'টো যথাস্থানে ফিরিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। সেখানে আমরা পিঁপড়ার একটি টিবি দেখতে পাই এবং তা জ্বালিয়ে দিই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কে জ্বালিয়েছে?" আমরা বললাম, "আমরা এ কাজ করেছি।" তিনি বললেন, "আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের।"[৩]

---

১. আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত অধ্যায়
২. মুসলিম
৩. আবূ দাউদ, কিতাবুল-জিহাদ

খাদিম, চাকর-বাকর ও শ্রমিকদের সাথে– যারা আর পাঁচজন মানুষের মতই মানুষ, তাদের মনিব ও মালিকের ওপর তাদের হক রয়েছে। তিনি ভাল ব্যবহার করার যেই শিক্ষা দিয়েছেন, তা এর অতিরিক্ত। হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন– আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, "তোমরা যা খাও তাদেরকেও তাই খেতে দাও, তোমরা যা পরো তাদেরকেও তাই পরাও। আর আল্লাহ্ তা'আলার মাখলূককে শাস্তিতে নিক্ষেপ করো না।"[১]

"যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অধীন করেছেন তারা তোমাদের ভাই, তোমাদের খাদিমও তোমাদেরই সাহায্যকারী, মদদগার। কাজেই যার ভাই যার অধীনে, তার উচিত হবে সে যা খাবে, তাকেও তাই খাওয়াবে। যা নিজে পরবে, তাকেও তাই পরতে দেবে। তাকে এমন কাজ করতে দেবে না– যা তার শক্তির বাইরে। যদি তাকে এমন কাজ করতে দিতেই হয়, তবে তুমি তার কাজে সহযোগী হবে, তাকে সাহায্য করবে।"[২]

আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন– এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে এলো এবং জিজ্ঞেস করল, "আমি আমার নওকরকে দিনে কতবার ক্ষমা করব? তিনি বললেন, "সত্তরবার।"[৩]

বর্ণনকারী আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই তার প্রাপ্য মজুরী দিয়ে দাও।"[৪]

বিশ্বজয়ী আদর্শ ও চিরন্তন নমুনা

হযরতুল উস্তাদ মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'খুতবাতে মাদ্রাজ'-এর একটি অংশ উদ্ধৃত করার মাধ্যমে এই অধ্যায় শেষ করতে চাই যেখানে সায়্যিদ সাহেব রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিপূর্ণ, বিশ্বজয়ী ও অবিনশ্বর জীবনচিত্র, তাঁর ব্যাপকতা ও পরিপূর্ণতা, মানব জাতির সকল স্তর ও সকল শ্রেণীর, এছাড়াও সব রকমের পরিবেশ, সকল যুগ, সকল পেশা, মোটকথা সব ধরনের অবস্থা, জীবনের প্রতিটি স্তর ও পর্যায়ের জন্য তাঁর পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক দিকনির্দেশনা ও মহোত্তম আদর্শ অত্যন্ত প্রভাবমণ্ডিত ও ভাষার অলঙ্কারপূর্ণ ভঙ্গিতে পেশ করেছেন। তিনি বলেন,

---

১. বুখারী, আল-আদাবুল-মুফরাদ, পৃঃ ৩৮
২. বুখারী ও আবূ দাউদ
৩. তিরমিযী ও আবূ দাউদ
৪. ইবন মাজাহ, আবওয়াবুর রুহুন, শ্রমিকের পারিশ্রমিক অধ্যায়

"সব শ্রেণীর মানুষের জন্য সব অবস্থায় আদর্শনীয় এবং মানুষের সকল প্রকার বিশুদ্ধ মানসিকতার সুষ্ঠু বিকাশ, পূর্ণাঙ্গ আচার-পদ্ধতি ও চরিত্রের মিলন যাঁর জীবনচরিতে ঘটেছে– তিনি একমাত্র মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ছাড়া আর কেউ নন।

আপনি যদি বিত্তশালী হয়ে থাকেন, তবে মক্কার আদর্শ ব্যবসায়ী ও বাহরায়নের বিত্তবান মহাপুরুষের মুহাম্মদুর রাসূল (সা) এর আদর্শ অনুসরণ করুন, দীনহীন দরিদ্র হয়ে থাকলে শি'বে আবূ তালিবের নিঃসহায় বন্দী ও মদীনায় আশ্রয় গ্রহণকারী মেহমানের হালচাল শুনুন, আপনি সম্রাট হয়ে থাকলে আরব সম্রাটের ইতিকাহিনী পাঠ করুন, শাসিত হয়ে থাকলে কুরায়শদের শাসিত শোষিত মুহাম্মদ (সা)-এর দিকে একটু খেয়াল করুন, বিজয়ী হয়ে থাকলে বদর ও হুনায়ন বিজয়ী মহাবীর সেনাপতির দিকে লক্ষ্য করুন, পরাজিত হয়ে থাকলে ওহুদ যুদ্ধের শিক্ষা গ্রহণ করুন, আপনি যদি উস্তাদ বা শিক্ষক হয়ে থাকেন, তবে সুফফা শিক্ষাগারের আদর্শ শিক্ষকের আদর্শ সামনে রাখুন, ছাত্র বা শাগরিদ হয়ে থাকলে জিবরাঈল রূহুল আমীনের সামনে বসে থাকা আদর্শ ছাত্রকে অনুসরণ করুন, আপনি যদি ওয়ায়েয, উপদেশদাতা বা বক্তা হন, তবে মদীনার মসজিদের মিম্বরে দণ্ডায়মান মহাপুরুষের আদর্শ বাণী শুনুন।

নিঃসঙ্গ নিঃসহায় অবস্থায় সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনে যদি আপনি আগ্রহী হন, তবে মক্কার নিঃসহায় মহাপুরুষের আদর্শ আপনার সামনে রয়েছে, আল্লাহ্‌য়ী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে দুশমনকে পরাজিত ও প্রতিপক্ষকে দুর্বল করে থাকলে মক্কাবিজয়ী মহাপুরুষের আদর্শ দেখুন। বিষয়-সম্পত্তি ও পার্থিব ব্যাপার সমূহকে গোছানোর ব্যাপারে খায়বর, বনী নযীর ও ফাদাকের ভূ-সম্পত্তিসমূহের মালিকের আদর্শ আপনার সামনে রয়েছে, পিতৃহীন ইয়াতীমের জন্য রয়েছে আবদুল্লাহ ও আমেনার দুলালের আদর্শ, শিশু বালকের জন্য রয়েছে হালিমার গৃহে প্রতিপালিত বালক মুহাম্মদের আদর্শ, যুবকের জন্য রয়েছে মক্কী রাখাল যুবকের আদর্শ।

আপনি যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফরে থাকেন, তবে বসরার বিদেশী বণিকের দৃষ্টান্ত আপনার সামনে রয়েছে। আপনি যদি আদালতের বিচারপতি অথবা পঞ্চায়েতের সালিসী হন, তবে ভোরের সূর্য ওঠার আগে কাবায় প্রবেশকারী বিচারকের প্রতি লক্ষ্য করুন, তিনি হাজরে আসওয়াদকে কাবার এক কোণে কেমন করে রেখেছিলেন। মদীনার খেজুর পাতায় ছাওয়া মসজিদে বসা

বিচারপতিকে লক্ষ্য করুন, আইনের বেলায় যাঁর কাছে বাদশাহ-ভিখারী ও আমীর-গরীবের মধ্যে পার্থক্যের কোন বালাই নেই।

আপনি স্বামী হয়ে থাকলে খাদীজা ও আয়েশার পুণ্যাত্মা স্বামীর আদর্শ চরিত পাঠ করুন। আপনার সন্তান-সন্ততি থাকলে ফাতেমার জনক ও হাসান-হুসায়নের নানার আদর্শ আপনার সম্মুখে রয়েছে।

মোটকথা, আপনি যে কেউ হোন না কেন, সবক্ষেত্রে আপনার জীবনপথে চলার জন্য আদর্শ ও আলোর দিশা মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যাপক জীবনচরিতে নিহিত রয়েছে। এজন্য সকল শ্রেণীর আদর্শ অনুসন্ধিৎসু ও নূরে ঈমানের তলবগারদের জন্য একমাত্র মোস্তফা-চরিতেই আলোর দিশা ও মুক্তির পথ নিহিত রয়েছে। মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনাদর্শ– যার সম্মুখে রয়েছে, একাধারে নূহ, ইবরাহীম, আইয়ূব, ইউনূস ও মূসা-ঈসা (আ) প্রমুখ মহাপুরুষগণের আদর্শ জীবনচরিতসমূহ। অন্য সকল নবীর জীবনচরিতসমূহ যেন একই ধরণের দ্রব্যসামগ্রীর বিপণীমালা আর মহানবী (সা)-এর আচার-ব্যবহার ও জীবনচরিত দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিপণীকেন্দ্র– যেখানে সকল ধরণের ক্রেতা ও সব রকমের পণ্যসামগ্রীর ছড়াছড়ি রয়েছে।"[১]

একদিকে তিনি রাত জেগে জেগে ইবাদত-বন্দেগীতে থাকতেন মশগুল, অপরদিকে শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণের প্রতিও রাখতেন সতর্ক দৃষ্টি। শাসক-শাসিতের মাঝে কোথাও অমিল বা বিরোধ ছিল না, সবাই তাদের অনুগত। আরেকটু উল্টে যান ইতিহাসের পাতা। অবাক হবেন তাঁদের ইবাদত, দুনিয়াবিমুখতা, দু'আ ও মুনাজাত, চারিত্রিক উৎকর্ষ, মাহাত্ম্যবোধ, ছোট ও দুর্বলদের প্রতি ভালোবাসা ও প্রেমবোধ, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে তাদের মধুর বিনম্র আচরণ, দয়া ও করুণা এবং জানের দুশমনকে অকপটে ক্ষমা করে দেয়ার কাহিনী পড়ে মনে হবে, কবি-সাহিত্যিকের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয় তাদের উর্বর কল্পনা ও তাদের বিরল প্রতিভার সিঁড়ি বেয়ে সেই চূড়ায় উপনীত হওয়া– যেখানে উপনীত হয়েছিলেন তাঁরা বাস্তবতার সিঁড়ি বেয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, অবিচ্ছিন্ন সূত্র ও সনদ আমাদের সংরক্ষণে না থাকলে এবং নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের সাক্ষ্য না পেলে, অনায়াসে এই সত্য ঘটনাকে কল্পকাহিনী ও উপকথা বলে চালিয়ে দেয়া হতো। সত্যি এই মহান ইনকিলাব, এই গৌরবদীপ্ত নতুন

---

১. আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী কর্তৃক অনূদিত 'খুতবাতে মাদ্রাজ'-এর বাংলা অনুবাদ 'নবী চিরন্তন' থেকে গৃহীত– অনুবাদক।

যুগের সূচনা মুহাম্মদ (সা)-এর প্রধান মু'জিযা এবং তাঁর এক মহাঅনুগ্রহ। সর্বোপরি তা রহমতে ইলাহী, এক মহাদান– যা সীমাবদ্ধ নয় স্থান-কাল-পাত্রের কোন সংকীর্ণ গণ্ডিতে। মহান আল্লাহ্ সত্যি বলেছেন :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔

"আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।"

[সূরা আম্বিয়া : ১৯৭]

মুহাম্মদ ব্রাদার্স প্রকাশিত অন্যান্য কিতাবসমূহ

০১। মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?
০২। নবীয়ে রহমত
০৩। সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (১ম-৭ম) খণ্ড
০৪। কারওয়ানে জিন্দেগী (১ম-৭ম) খণ্ড
০৫। শায়খুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (র)
০৬। হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী (র)
০৭। তারুণ্যের প্রতি হৃদয়ের তপ্ত আহ্বান
০৮। হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)
০৯। হযরত মুজাদ্দিদে আল্ ফেসানী
১০। ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান
১১। ইসলাম ঃ ধর্ম, সমাজ সংস্কৃতি
১২। সীরাতে রসূল আকরাম (সা.)
১৩। হযরত আলী-এর জীবন ও খিলাফত
১৪। নতুন পৃথিবীর জন্ম দিবস
১৫। ঈমানদীপ্ত কিশোর কাহিনী
১৬। ইসলামী জীবন বিধান
১৭। সালাত : গুরুত্ব ও তাৎপর্য
১৮। সিয়াম : গুরুত্ব ও তাৎপর্য
১৯। হজ্ব : গুরুত্ব ও তাৎপর্য
২০। যাকাত : গুরুত্ব ও তাৎপর্য
২১। আরকানে আরবা'আ
২২। ছোটদের আলী মিয়া
২৩। ঈমান যখন জাগলো
২৪। কারওয়ানে মদীনা
২৫। প্রাচ্যের উপহার
২৬। বিধ্বস্ত মানবতা
২৭। আমার আম্মা
২৭। আমার আব্বা
২৮। নয়া খুন
২৯। সীরাতে সাইয়িদ আহমেদ শাহীদ রহ. (১ম-২য়)
৩০। পুরানো চেরাগ (১ম-৩য়) খণ্ড
৩১। ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব
৩২। বিশ্ব সভ্যতায় রসূল আকরাম (সা.)
৩৩। হযরত আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহ.)
৩৪। মুসলিম লেখক ও প্রাচ্যবিদদের ইসলাম বিষয়ক গবেষণা মূলক মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা
৩৫। দারুল দেওবন্দ ঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য

ইসলামী চিন্তাবিদ এ জেড এম শামসুল আলম রচিত বই

৩৫। বাঙ্গালী সংস্কৃতি
৩৬। মুসলিম সংস্কৃতি
৩৭। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি
৩৮। শিশু পালন
৩৯। মহানবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)
৪০। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা
৪১। বিবাহ ও প্রেম
৪২। বিবাহ ও যৌনতা
৪৩। পরিবার পরিজন
৪৪। হায়াত মওত দৌলত
৪৫। নারীর শ্রেষ্ঠত্ব
৪৬। সাহাবীদের সোনালী জীবন - ১ম
৪৭। সাহাবীদের সোনালী জীবন - ২য়
৪৮। সাহাবীদের সোনালী জীবন - ৩য়
৪৯। সাহাবীদের সোনালী জীবন - ৪র্থ

অন্যান্য লেখকের আরো কিছু বই

৫০। জীবন গড়ার পথে– সি. জি. ডোকান
৫১। বাইবেলের স্বরূপ ও খৃস্টধর্ম– মাওলানা ইমদাদুল হক
৫২। আদর্শ সমাজ গঠনে নামাযের ভূমিকা
৫৩। দাওয়াতের উপহার– মাওলানা মুহাম্মদ কলীম সিদ্দীকী
৫৪। কুরআন আপনাকে কী বলে?– হযরত মাওলানা মনযূর নোমানী (র)
৫৫। ইসলামে মা, মেয়ে ও স্ত্রী– আবূ সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই
৫৬। শির্‌ক বিদআতের ভয়াবহতা– আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই
৫৭। আমার বিশ্বাস– আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই
৫৮। বিশ্বায়ন– ইয়াসির নাদীম
৫৯। কুরআনের উপদেশাবলী– মারমাডিউক পিকথল
৬০। ঘুষ ও হাদিয়া ঃ কেন কখন কিভাবে– মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী
৬১। মাতৃভাষা আন্দোলন ও ইসলাম– ড. মু. আবদুর রহমান আনওয়ারী
৬২। মহানবী (সা.)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল– জেনারেল আকরার খান
৬৩। জিহাদে সিদ্দিকী আকরার (রা.)– জেনারেল আকরার খান